১৯৮৫

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। কলিকাত

১লা জানুয়ারী ১৯৮৫

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৮২) শতবার্ষিকী গ্রন্থ

সম্পাদনা . প্রণতি মুখোপাধ্যায

Dinendranath Tagore (1882-1982). A Centenary Volume.

Edited by Pranati Mukhopadhyay

বাঁধাই —বেঙ্গল বুক বাইণ্ডিং

প্রচ্ছদ ও ছবির ব্লক মুদ্রণ—দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রসেস

প্রকাশক—সুশান্ত নাগ। টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। কালীঘাট পার্ক, কলিকাতা ২৬

মুদ্রক—সিদ্ধার্থ মিত্র। বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

ভূমিকা

১৯৮২ সালে দিনেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী উৎসব পালনের সময় আমরা তাঁর স্মরণে যে গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প করেছিলুম, এই দিনেন্দ্র-শতবার্ষিকী গ্রন্থ তারই ফল। একটি উল্লেখযোগ্য অসংশয়ী স্বচ্ছচিন্তাসম্পন্ন আনন্দময় ব্যক্তিত্বের অধিকাব সত্ত্বেও তাঁব ছোট-বড় কোনো পরিচয়ই দেশবাসীর গোচরে আসেনি। তাঁর মৃত্যুর পর যে দিনেন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল সেটিও দুষ্প্রাপ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিপত্র, দিনেন্দ্রনাথের নিজের লেখা চিঠি, একটি জীবনীমূলক রচনা, ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণ, তাঁর সঙ্গীত শিক্ষকতার আলোচনা এবং অন্তিম দিনগুলির বিস্তাবিত বিবরণেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব সম্পূর্ণ বীণ কাব্যটিও ধরে দেওয়া গেল। উন্নতশীর্ষ হিমালয়সদৃশ সকল-ক্ষুদ্রতা-উত্তীর্ণ এই বিশাল-হৃদয় মানুষটির কিছুটা পরিচয় তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সাহিত্য ও সঙ্গীত অনুরাগী পাঠকদের কাছে তুলে ধরা গেল।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

১লা জানুয়াবী ১৯৮৫
টেগোব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
কলকাতা-২৬

সূচী

দিনেন্দ্রনাথ

অকস্মাৎ কাল দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ আশ্রমে এসে পৌঁছল। শোকের ঘটনা উপলক্ষ্য করে আনুষ্ঠানিকভাবে যে শোকপ্রকাশ করা হয়, তার প্রথাগত অঙ্গ যেন একে না মনে করি। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা সকলে দিনেন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানত না—কর্মের যোগে সম্বন্ধও তাঁর ইদানীং এখানকার অল্প লোকের সঙ্গেই ছিল। অধ্যাপকেরা সকলেই এক সময়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও তাঁর সঙ্গে স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ তাঁদের ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল।

যে শোকের কোনো প্রতিকার নেই, তাকে নিয়ে সকলে মিলে আন্দোলন করে কোনো লাভ নেই; এবং আত্মীয়বন্ধুদের যে শোক, অন্য সকলের মনে তার সত্যতাও প্রবল নয়। এই মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে মৃত্যুর স্বরূপকে চিন্তা কববার কথা মনে রক্ষা করা চাই। সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করে এমন কোনো কোণ নেই, যেখানে প্রাণেব সঙ্গে মৃত্যুর সম্বন্ধ লীলায়িত হচ্ছে না; এই যে অনিবার্য সঙ্গ, এ যে শুধু অনিবার্য তা নয়, এ না হলে মঙ্গল হত না। দুঃখকে মানতেই হবে; শোক দুঃখ, মিলন বিচ্ছেদ, উন্মীলন নিমীলনেই সমাজ গ্রথিত,—এই আঘাত অভিঘাতের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, যে কঠোরতা আছে, সেইটি না থাকলেই যথার্থ দুঃখেব কারণ হত। সমস্ত জগৎ জুড়ে মানুষের মধ্যে অপরিসীম দুঃখ, আমরা তার সৃষ্টির দিকটা, মহত্ত্বের দিকটাই দেখব; তার মধ্যে যে অপরাজিত সত্য, সে তো অবসন্ন হয় না—অথচ মানুষের দুঃখেব কি অন্ত আছে? মৃত্যুকে যদি বিচ্ছিন্ন করে দেখি, তাহলেই আমরা অসহিষ্ণু হয়ে নালিশ করি--এর মধ্যে মঙ্গল কোথায়? এই দুঃখের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে, নইলে দুর্বলতায় সৃষ্টি অভিভূত হত—দুঃখ আছে বলেই মনুষ্যত্বের সম্মান। দুঃখের আঘাত বেদনা মানুষের জীবনে নানান কান্নায় প্রকাশ; ইতিহাসের মধ্যে যদি দেখি, তাহলে দেখব অপরিসীম দুঃখকে আত্মসাৎ করে মানুষ আপন সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে সব এখন কাহিনীতে পরিণত। ইতিহাসে কত দুঃখপ্লাবন ঘটেছে, কত হত্যাব্যাপার, কত নিষ্ঠুরতা—সে সব বিলুপ্ত হয়েছে; রেখে গেছে দুঃখবিজয়ী মহিমা, মৃত্যুবিজয়ী প্রাণ।—মৃত্যুর সম্মুখ দিয়ে প্রাণের ধারা চলেছে—এ নাহলে মানুষের অপমান হত। মৃত্যুর স্বরূপ আমরা জানিনে বলে কল্পনায় নানা বিভীষিকার সৃষ্টি করি। প্রাণলোককে মৃত্যু আঘাত করেছে, কিন্তু বিধ্বস্ত করতে পারেনি—প্রাণের প্রকাশের অন্তরালে মৃত্যুর ক্রিয়া, প্রাণকে সে-ই প্রকাশিত করে। সম্মুখে প্রাণের লীলা, মৃত্যু আছে নেপথ্যে।

অনেকে ভয় দেখায় মৃত্যু আছে, তাই প্রাণ মায়া। আমরা বলি, প্রাণই সত্য, মৃত্যুই মায়া;

মৃত্যু আছে তৎসত্ত্বেও তো যুগে যুগে কোটি কোটি বর্ষ ধরে প্রাণ আপনাকে প্রকাশিত করে আসছে। মৃত্যুই মায়া। এই কথা মনে করে দুঃখকে যেন সহজে গ্রহণ করি ; দুঃখ আছে, বিচ্ছেদ ঘটল, কিন্তু এর গভীরে সত্য আছে—একথা যেন স্বীকার করে নিতে পারি।

আশ্রমের তরফ থেকে দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যা বলবার আছে, তাই বলি। নিজের ব্যক্তিগত আত্মীয় বিচ্ছেদের কথা আপনার অন্তরে থাক্—সকলে মিলে তা আলোচনা করার মধ্যে অবাস্তবতা আছে, তাতে সঙ্কোচ বোধ করি। আমাদের আশ্রমের যে একটি গভীর ভিত্তি আছে, তা সকলে দেখতে পান না। এখানে যদি কেবল পড়াশুনার ব্যাপার হত তাহলে সংক্ষেপ হত, তাহলে এর মধ্যে কোনো গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পেত না। এটা যে আশ্রম, এটা যে সৃষ্টি, খাঁচা নয়, ক্ষণিক প্রয়োজন উত্তীর্ণ হলেই এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হবে না, সেই চেষ্টাই করেছি। এখানকার কর্মের মধ্যে যে-একটি আনন্দের ভিত্তি আছে, ঋতু-পর্যায়ের নানা বর্ণগন্ধগীতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টায়, আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র আমার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, তখন চারদিকে ছিল নীরস মরুভূমি- আমার পিতৃদেব কিছু শালগাছ রোপণ করেছিলেন, এছাড়া তখন চারদিকে এমন শ্যামশোভার বিকাশ ছিল না। এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতার শ্যামশোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সঙ্গীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভাব যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীব-ভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র। আমি যে সময়ে এখানে এসেছিলাম, তখন আমি ছিলাম ক্লান্ত ; আমার বয়স তখন অধিক হয়েছে—প্রথমে যা পেরেছি, শেষে তা-ও পারিনি। আমার কবিপ্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি, সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন, সেবাও করেছেন ; কিন্তু তার রূপ নেই বলে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ, এতো যাবার নয়—যতদিন ছাত্রদের সঙ্গীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অধিগত করে থাকবেন ; আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়। এখানকার সমস্ত উৎসবের ভার দিনেন্দ্র নিয়েছিলেন, অক্লান্ত ছিল তাঁর উৎসাহ। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়নি—গান শিখতে অক্ষম হলেও তিনি ঔদার্য দেখিয়েছেন—এই ঔদার্য না থাকলে এখানকার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হত না। সেই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন বৈতালিকে যে রসমাধুর্য আশ্রমবাসীর চিত্তকে পুণ্যধারায় অভিষিক্ত করে, সেই উৎসকে উৎসারিত করতে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। এই কথা স্মরণ করে তাঁকে সেই অর্ঘ্য দান করি, যে-অর্ঘ্য তাঁর প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪২ রবীন্দ্রনাথের ভাষণ)

দিনেন্দ্র-রচনাবলীর ভূমিকা

দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন তার নিজের গান শুনিনি। কখনো কখনো কোনো কবিতায় তাকে সুরে বসাতে অনুরোধ করেছি, কথাটাকে একেবারেই অসাধ্য বলে সে উড়িয়ে দিয়েছে। গান নিয়ে যারা তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, তারা জানে সুরের জ্ঞান তার ছিল অসামান্য। আমার বিশ্বাস গান সৃষ্টি করা এবং সেটা প্রচার করার সম্বন্ধে তার কুণ্ঠার কারণই ছিল তাই। পাছে তার যোগ্যতা তার আদর্শ পর্যন্ত না পৌঁছয়, বোধকরি এই ছিল তার আশঙ্কা। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা; কাব্যরসে তার মত দরদী অল্পই দেখা গেছে। তা ছাড়া কবিতা আবৃত্তি করার নৈপুণ্যও ছিল তার স্বাভাবিক। বিশেষ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরকে আবৃত্তি শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তাকেই অনুরোধ করতে হয়েছে। অথচ কবিতা সে যে নিজে লেখে, একথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়। অনেকদিন পূর্বে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা সে বই আকারে ছাপিয়েছিল। ছাপা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পাঠকসমাজে সেটা প্রচার করবার জন্যে সে লেশমাত্র উদ্যোগ করেনি। আমার মনে হয় কোনো একজনের উদ্দেশে তার রচনা নিবেদন করাতেই পেয়েছে সে তৃপ্তি, পাঠকসাধারণের স্বীকৃতির দিকে সে লক্ষ্যই করেনি। চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য, এমন কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করচি, তার স্বকীয় রচনা চর্চার বাধাই ছিলেম আমি। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়। আজ এতেই আমি সুখ বোধ করি যে, তার জীবনের একটি প্রধান পরিতৃপ্তির উপকরণ আমিই তাকে জোগাতে পেরেছিলুম।

দিনেন্দ্রের যে পরিচয় আচ্ছন্ন ছিল, যে পরিচয় শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকাশ পাবার অবসর পায়নি, আমাদের কাছে সেইটিরই প্রতিষ্ঠা হল তার ওই স্বল্প সঞ্চিত গানে ও কবিতায়। রচনা নিয়ে খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা তার কিছুমাত্র ছিল না, তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তার নিজের ইচ্ছায় এতকাল এর অধিকাংশই সে প্রকাশ করেনি এবং বেঁচে থাকলে আজও করত না। সেইজন্যে এই বইটি সম্বন্ধে মনে কোনো সঙ্কোচ নেই যে, তা বলতে পারিনে। কিন্তু তার বন্ধু ছিল অনেক, তার

ছাত্রেরও অভাব ছিল না, এদের সম্মুখে এবং আমাদের মত স্নিগ্ধজনের কাছে এই লেখাগুলি নিয়ে তার একটি মানসমূর্তির আবরণ উদ্ঘাটিত হল—এই আমাদের লাভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর রচনাগুলির যে সংকলন প্রকাশিত হয় তার ভূমিকা)

উৎসর্গ

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর
তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের
এবং সেই সঙ্গে
সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী
আমার সকল গানের ভাণ্ডারী
শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে
এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো
সমর্পণ করিলাম

১৫ই ফাল্গুন
১৩২২

('ফাল্গুনী'র উৎসর্গপত্র)

আশীর্বাদ

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে

প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান,
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।

২ পৌষ
১৩৩৯

তোমার মুখর দিন, হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি
আপনার দিগ্‌দিগন্তে রবির সঙ্গীতরশ্মিগুলি
প্রহর করিয়া পূর্ণ। মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে
উদার তোমার দান। রবিকর করি মর্মগত
বনস্পতি আপনার পত্রপুষ্পে করে পরিণত,
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব-সমারোহে। সেইমতো তোমার সাধনা
রবির সম্পদ হত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-'পরে স্নেহ সুগভীর,
রবির সঙ্গীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির।

চিঠি

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আঁতিপাঁতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশি ইস্পানি
প্রকাশ্যে তার থাক-না যতই সাদামুখের ঢঙ,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম।
চারুকণ্ঠে ঠাঁই নাহি তার, ধূলায় পরিণাম।

যূথী বলে, 'আতিথ্য লও, একটুখানি বোসো।'
আমি বলি চমকে উঠে, আরে রোসো রোসো।
জিতবে গন্ধ হারবে কি গান নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম জানি নে কার জিত।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁই বাগানের আরেক দিনের গান যে রচেছিনু।

ঘরের খবর পাইনে কিছুই গুজব শুনি নাকি
কুলিশপানি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।

হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে।
জানি তুমি বলবে আমায় "থামো একটুখানি,
বেণু বীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝমঝমানি।"
শুনে আমি রাগব মনে করো না সেই ভয়—
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারা তো নয় ফাঁকি,
গিলটি করা তকমা-ঝোলা নয় তাহাদের খাকি।
কপাল জুড়ে নেইতো তাদের পালোয়ানের টীকা
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনও তো সাজাবে জুঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়বে তারাই চিরটা কাল ? গড়বে পাষাণ কারা ?
রাজ প্রতাপের দম্ভ সেতো এক দমকের বায়ু,
সবুর করতে পাবে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে
আজ আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,
ভগবানের ব্যথার পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ,
হাতকড়িরই কড়াকড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে—
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উলটো দিকের পথে।

জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু—
ধর্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের জোরের প্রভু।
রক্ত-বর্ণের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে
রাহুর দম্ভ রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয়না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।

টুটল কত বিজয় তোরণ, লুটল প্রাসাদ-চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন-কুর্তি সঙিন-মূর্তি রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে ছিঁড়বে রাঙা পাগ—
চূর্ণ করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্যসিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে
ফোঁসে সর্প হিংসাদর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে 'আমিই সত্য—দেবতা মিথ্যা মায়া',
সেদিন যেন কৃপা আমায় কবেন ভগবান
মেশীনগানেব সন্মুখে গাই জুঁই ফুলেব এই গান।

স্বপ্নসম পববাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই
ও আমার জুঁই!
অজানা ভাষাব দেশে সহসা বলিলি এসে
"আমারে চেন কি?"
তোর পানে চেয়ে চেয়ে হৃদয় উঠিল গেয়ে
চিনি চিনি সখী!
কত প্রাতে জানায়েছে চিবপবিচিত তোর হাসি
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহব্যথাব মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই
ও আমার জুঁই!
আজ তাই পড়ে মনে বাদল-সাঁঝের বনে
ঝব ঝর ধাবা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া যেন কী-স্বপনে-পাওয়া,
ঘুবে ঘুরে সারা।
সজল তিমিব তলে তোর গন্ধ বলেছে নিশ্বাসি
"আমি ভালোবাসি।"

মিলন সুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই
ও আমার জুঁই!
মনে পড়ে কতরাতে দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে কী বেদনা বক্ষে আনে
চক্ষে আনে জল।

সে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি
"আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই
ও আমার জুঁই!
বক্ষে এসেছিস কার যুগ-যুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া—
বারে বারে দ্বারে এসে কোন্ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া!
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন বাঁশি
"আমি ভালোবাসি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
২০শে ডিসেম্বর ১৯২৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্মদিনের চিঠি

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনু দাদাজি চিরঞ্জীবেষু

অবতরণিকা

পাইয়া যেদিন সাধের নাতি
ফুলিল দাদার বুকেব ছাতি
সেই দিন আজ দেখা দিয়েচে
দিনু দাদাজিব গুণ অসীম
গানে তানসেন আকাবে ভীম
চিবজীবী হয়ে থাকুক বেঁচে।

নিমন্ত্রণ পত্র

আনন্দ দিয়ে দাদার নয়নে
দলবল সাথে বসিবে ভোজনে
ববি যবে বসিবে পাটে
মিটাইব সাধ তোমায় হেবি
শুভ কাজে হেন কর না দেরি
কহিব তোমায় সাঁটে
যতদিন বাঁচি ববষ বরষ
এমনি সুদিনে গজাইবে রস
নীরস শরীরে মোব
ইহারি আশায় দাদা এ তব
বছরের পর বছর নব
থাকিব হরষে ভোর।

[প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৬]

রবীন্দ্র-পত্রগুচ্ছ

১ ॥

কল্যাণীয়েষু

দিনু, জালে জড়িয়ে পড়েছি—ছিঁড়ে বেরবার চেষ্টা করচি এখনো সুবিধা দেখচিনে। একটা আপোসের সম্ভাবনা নিকটবর্তী—সেইটে হলেই দৌড় দেব। ইতিমধ্যে তোরা রিহার্সাল দিয়ে রাখ্। তুই ধনঞ্জয়ের পার্ট এখন নে—যদি সময় মত ছাড়া পাই তাহলে আমি গিয়ে রঙ্গমঞ্চের ফকিরি গ্রহণ করব। এখন যে রঙ্গমঞ্চে চড়িয়েচে এব পালা কোন্ পঞ্চমাঙ্কে গিয়ে শেষ হবে কে জানে।

ববিদাদা

চেষ্টা করচি কিন্তু এখনো এণাকে ভুলতে পাবচিনে - সবাই বলছে বড্ড বোগা হয়ে গেছি। অবস্থা খারাপ। কিন্তু শুনতে পেলুম বিবহে এণাব শবীবের উন্নতি হযেচে।

২ ॥

HOTEL ALGONQUIN
NEW YORK

কল্যাণীয়েষু

দিনু তোব গানে আজ আমাদের ৭ই পৌষ মুখরিত হযে উঠেচে জানি। তোদের গানের সঙ্গে এবার আমি সুব মেলাতে পারলুম না এই ব্যথা আমাকে কেবলি পীড়া দিচ্চে। ৭ই পৌষ আবার আসবে—আবাব তোদের মাঝখানে বসে বলব নমস্তেহস্তু এই আমার সান্ত্বনা। ইতিমধ্যে আমার বিচ্ছেদ মিলনের পাথেয় সংগ্রহ করতে থাকুক। তোবা আমার আশীর্বাদ জানিস্।

রবিদাদা

৩ ॥

315 EAST TWENTY THIRD STREET
CHICAGO

দিনু তোকে একটা লিপিকা লিখে পাঠাতে যাচ্ছিলুম হেনকালে তোর একখানা চিঠি এসে পৌঁছল। এর থেকে শান্তিনিকেতনের কিছু আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু তোর চিঠি পৌষের, তখনও উত্তর হাওয়ায় আমলকী বীথির পাতা ঝরে ঝরে পড়চে। এতদিনে সেখানে "ফাগুন লেগেচে বনে বনে।" কিন্তু চিকাগো-পুরী আজও ধোঁয়া এবং মেঘের কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁপচে—সূর্যের আলো যেন

চীনেম্যানের মত চণ্ডু খেয়ে ভোঁ হয়ে আছে—আর আকাশটাকে দেখাচ্চে যেন সওদাগরের আপিসের ব্লটিং কাগজ, পৃথিবীব সমস্ত কালী শুষে একেবারে মসীবর্ণ। এমন নিরালোক দেশে আমার নির্বাসন কোন্ পাপে ?

আমার দেশের খবর সমুদ্র পার হতে হতে নিতান্ত অস্পষ্ট হয়ে এখানে পৌছয়- শুভ কি অশুভ তা ভাল করে বুঝতে পারিনে। আমি কেবলি ভাবচি এই ঘূর্ণি ঝড়েব দিনে শান্তিনিকেতনের তরী কোন মুখে বাইতে হবে। সহজ পন্থা হচ্চে হাল ছেড়ে দিয়ে ঝড়ের মুখে একে সমর্পণ করা, কিন্তু সে পথ পারের দিকে না গিয়ে তলাব দিকে যেতে পারে। আমাদেব দেশে প্রবাদ আছে কাশী পৃথিবীর বাইবে, এইজন্যে বাসুকী মাথা নাড়লেও কাশী নড়ে না। আমি সেইবকম মনে করি, শান্তিনিকেতন কোনো বিশেষ ভূখণ্ডের অন্তর্গত নয় – এখানে রাষ্ট্র আন্দোলনের দোলা পৌঁছবে না— এখানে সকল দেশের মানুষ এসে অনায়াসে মিলবে। ওখানে যদি আমরা পলিটিক্সের কাঁটার বেড়া লাগাই তাহলে পৃথিবীব সকল বড় রাস্তার সঙ্গে ওখানকার যোগ বাধাগ্রস্ত হবে। আমাদের দেশের মঙ্গল উৎসবে কেবল যে আহূতদেব স্থান তা নয়, সেখানে ববাহূত এবং অনাহূতও বাধা পায় না। শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষেব সেই যজ্ঞভূমি, ওখান থেকে ভারতবর্ষেব নিমন্ত্রণ সর্বত্র পাঠান হয়েচে, অতএব সেখানে সদব বা খিড়কির কোনো দবজা ত বন্ধ কবা যেতে পাবে না। কেল্লার রাস্তা দুর্গম এবং দরজায় আগল—সেখানে লড়াইয়ের ব্যবস্থা, পদে পদে প্রবেশ নিষেধ। আজ ভাবতবর্ষেব সর্বত্রই সেই কেল্লার বাস্তায় পাহারা বসানো যেতে পারে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের কোনো দরজাই সঙ্কীর্ণ করা যেতে পারে না—ওখানে যে ভাবতীব আসন তিনি বিশ্বভারতী – আজকের দিনে এই কথাটা ভোলবার ভয় আছে বলে আমি বড় উদ্বিগ্ন। কালিদাস বলেচেন—"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"—আমরা বড়র কাছেই বব প্রার্থনা কবব তাতে আপাতত ফল না পেলেও প্রার্থনাব দ্বারা আমাদেব দুর্গতি ঘটবে না। কিন্তু ছোটব কাছে প্রার্থনা কবে আপাতত যদি বা ফল পাই সেই প্রার্থনার লাঞ্ছনা কখনও ঘুচবে না। তেমনি আমাদের ধর্মকে খাটো করে ফললাভের চেষ্টা কবলে পবিণাম ভালো হবে না। মানুষকে বড় করে যখন জানি তখনই দেশকে সত্য করে পাই।

যাই হোক আমি দেশে ফিরতে আর দেরী করব না। যত শীঘ্র পারি যাব। এই সঙ্কটের সময় দূরে থাকা কর্তব্য নয়। মনে নিশ্চয় জানি দেশে গিয়ে কঠিন আঘাত পেতে হবে,—কবেই বা না পেয়েচি—কিন্তু আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে ইচ্ছা করচে না। রবিদাদা

এণ্ডরুজ কোথায় থাকেন তার ঠিকানা নেই তাই তোর চিঠির মধ্যে তাঁকে লিখলুম।

৪ ॥

কল্যাণীয়েষু

বোটে করে ভেসে চলেছি—কবে কোথায় গিয়ে এ চিঠিটা ডাকে দিতে পারব কে জানে। এগারই মাঘ রাত্রে আমাদের শান্তিনিকেতনের ছেলেরাই উপাসনার মন্ত্রগুলি পড়বে। ওদের

মধ্যে যে কয়জনের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে তাদের অভ্যাস করিয়ে রাখিস্। প্রথম বেদ গানটি দালানের বেদী থেকে হয়ে গেলে পর আমাদের বেদী থেকে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে পিতা নোঽসি পাঠ করব—ওটা হারমোনিয়মের সঙ্গে বাজিয়ে করলে সুরটা ঠিক মিলবে। ছেলেদের ওটা যন্ত্রের সঙ্গে অভ্যাস করিয়ে নিস। তাবপর ওবা সেই নানকের গানটি গাবে। তারপরে যথাসময়ে যো দোবোঽগ্নৌ, সত্যংজ্ঞানমনন্তং, স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়ম (গায়ত্রী বাদ দিয়ে), নমস্তে সতে তে, (এই নমস্তে সতে তে সব ছেলেরা মিলে পাঠ করবে), অসতো মা সদ্গময় এবং সবশেষে এসাস্য পরমাগতিঃ পাঠ করে স্বাধ্যায় শেষ হবে। ক্ষিতিমোহনবাবু আমার সঙ্গে বেদীতে বসলে তিনি ঐগুলির বাংলা অর্থ পাঠ করবেন এবং তাঁব প্রতি আমার অনুবোধ এই যে তিনি যেন উদ্বোধনটি বলেন কিম্বা পাঠ কবেন। তিনি যদি সম্মত না হন তাহলে ভাঙা গলায় আমাকে একলা একাজ চালাতে হবে - সেটার পরিণাম আমাব পক্ষে ভাল হবে না, সেজন্য এখন থেকে উৎকণ্ঠিত আছি।

সকালেব গান সমস্তই আমাদেব ছেলেরা এবং তুই ও অজিত মিলে গাওয়া হবে--সঙ্গে তেজেশকে নিতে পারিস্ কিন্তু চুনী কিম্বা নগেন আইচকে নয়। আমাদের গাইয়ের দলে অনঙ্গবাবু ও ডাক্তারবাবুকে নিয়ে দলপুষ্টি হবে—উঠোন জমাতে হবে ত।

সকালে ছটা গানের বেশি দবকার নেই। আমার খাতায় ত নিম্নলিখিত নতুন গান কটি সকালের সুবে আছে ঃ—

ভোরের বেলায় কখন এসে	প্রথম
বাজাও আমারে বাজাও	উদ্বোধনের পর
আমার মুখের কথা তোমার নাম	স্বাধ্যায়ের পর
জানি এ দিন যাবে	শেষ
তুই কেবল থাকিস সরে সরে	
গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র	

যদি ক্ষিতিমোহন বাবুর ঝুলি থেকে সকালের সুরের একটা ভজন আদায় করতে পারিস্ তাহলে সেও অতি উত্তম হয়।

আর যাই করিস ১১ই মাঘে গলাগুলি দিব্যি করে ভেঙে বসে থাকিস নে। তোকে পূর্বেই উপদেশ দিয়েছি শিশি দুয়েক Formamint আনিয়ে রাখিস্ তাতে গলার উপকার হবে—কিন্তু ক্রমাগত খাসনে তাতে ফল নষ্ট হতে পারে। তোর দধিভোজনটা আপাতত বন্ধ রাখিস্। আমাদের বৈতালিক দলকে কিছুদিন সকালে হিমে গাইয়ে বেড়ানো বন্ধ রাখতে হবে—উৎসবের পরে আবার তাদের কাকলী সুরু হবে।

রবিদাদা

৫ ॥ ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

দিনু, বিদ্যালয়ের জন্যে মনে কোনো উদ্বেগ রাখিস্‌নে। মঙ্গল কখনো মরতে পারে না যদি তা মরে তবে উচ্চতর মঙ্গলকে জীবন দিয়ে তবে মরবে— ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নেই। আমরা যেটুকু সত্য চেষ্টা করি তার সত্য ফল হবেই। এটা তো দেখতেই পাচ্চিস তোদের জীবনের যা সবচেয়ে ভাল তাই তোরা বিদ্যালয়কে দিচ্চিস সে দেওয়া যদি ব্যর্থই হবে তবে এরকম করে নিচ্চেন কেন? যা মঙ্গল ঈশ্বর তাই এই বিদ্যালয়ের দিকে টেনে নেবেন—বিপদ সম্পদ আনুকূল্য প্রতিকূলতা সকল রকম বেশেই সেই মঙ্গল এসে জুটবে। এর আগেও তাই ঘটেছে। কতবার কত গুরুতর আঘাত, বেদনা, অভাব, বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে টলমল করতে করতে একে এগোতে হয়েছে—সে সমস্তই কেটে গিয়েছে—যদি সত্যই আবার বাইরের থেকে সঙ্কটের দিন এসে থাকে তবে নিশ্চয় জানিস্ সেই লড়াইয়ে আমাদের ভালই হবে। মনকে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করিসনে—যা ঘটে তা ঘটুক আমাদের কর্তব্য আমরা করে যাব।

তোর শরীরটা বেশ ভাল হয়ে উঠলে আমি নিশ্চিন্ত হই। আমার বিশ্বাস আর মাস খানেক পরে শীতটা বেশ রীতিমত ঘনিয়ে এলে ওব অস্বাস্থ্যটা কেটে যাবে। আবার কিছুদিন Sanatogen খেয়ে দেখনা।

নূতন অধ্যাপক কি কাউকে রাখা হয়েছে? ছাত্ররা এবার এখনো সবাই এসে জোটেনি শুনচি। তারা কি বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে? এবার বাংলাদেশের সর্বত্রই ম্যালেরিয়ার উপদ্রব কিছু বেশি। তোদের ওখানেও শুনচি ম্যালেরিয়া বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে।

আমি পদ্মার মাঝখানে একটি নির্জন চর আশ্রয় করে চুপচাপ বসে আছি। আমার এই নির্মল প্রশান্ত নির্জনতার অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল। তাই কাজকর্ম ছেড়ে এখানে চলে এসেছি। ইতি ২১শে কার্তিক ১৩১৮

তোর রবিদাদা

৬ ॥ ওঁ

কল্যাণীয়েষু

দীনু এখানে এসে অবধি তোদের কোনো চিঠিপত্র পাই নি। কেমন আছিস্ কোথায় আছিস সমস্ত আন্দাজে অন্ধকারে ঝাপসা। আমরা যে দেশে এসেছি এ একেবারেই গানের দেশ নয়, এ ছবির দেশ। এরা এদের সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ছবি দিয়েই ব্যক্ত করে। এদের গান শুনেছি কিন্তু তাকে গান বলা চলে না—সুর সহযোগে আওয়াজ করা মাত্র। এদের নাচ

খুবই সুন্দর কিন্তু গান যত দূর কাঁচা হতে হয়। কাজেই আমারো গানে স্ফূর্তি একেবারেই নেই। গানের সমস্ত স্মৃতি পর্যন্ত আছন্ন হয়ে যেত যদি না প্রায় মাঝে মাঝে মুকুলটা চীৎকার শব্দে যখন তখন যেখানে সেখানে অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং নির্দয় ভাবে আমার গান না আওড়াত। এমনি ছুর্ভিক্ষের দশা যে মুকুলকেও থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। যাই হোক এখন ওকেও ফেলে যেতে হচ্ছে। ও এখানে থেকে ছবি আঁকার চর্চা করবে। আমেরিকায় গান বাজনার অভাব হবে না। কিন্তু আমাদের সেই শান্তিনিকেতনের মত গানে জবজবে অবকাশ কোথায় পাব? তোর ঘরের সেই গানের আসর ছবির মত মনে পড়ে—আর মনে পড়ে তোর জানলার গরাদের বাইরে থেকে কালো কালো জ্বলজ্বলে সেই চোখগুলো। এবারকার বর্ষার পালা শান্তিনিকেতনের মাঠের উপর থেকে আপন পাওনা চুকিয়ে নিয়ে চলে গেছে—আকাশ থেকে বাদল মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে শ্রাবণের দলবল বিদায় নিয়েচে —এখন শরতের শিউলি ফোটার সময় হয়ে এল। কিন্তু আশ্রমের এইসব ঋতু অতিথিরা কি তাদের কবি-বৈতালিকের কথা স্মরণ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে যাবে না? বৎসরে বৎসরে তারা যে বিচিত্র অভ্যর্থনা পেয়ে এসেচে এবারে তার আয়োজনের ত্রুটির নালিশ ওখানকার মাঠে মাঠে রয়ে গেল। তাই থেকে থেকে মনটার ভিতরে ঝটপট করে ওঠে—কিন্তু চলি গো চলি গো যাই গো চলে।

তোদের বিদ্যালয়ের জন্য একটা জাপানী ঘণ্টা পাঠাচ্চি। আহার উপাসনা প্রভৃতি সাধারণ আহ্বানের বেলায় এটা ব্যবহার করলে চলবে। এই ঘণ্টা আমার একজন জাপানী বন্ধু বিদ্যালয়কে দান করেচেন। রেলগাড়ি চলচে আমিও চলচি তাই লেখাটা অনেকটা তোব ছাঁদের হয়ে এল

তোদের রবিদাদা

৭॥

ওঁ

তোসামারু
চীনসাগর

কল্যাণীয়েষু

দিনু, কোথায় আছিস জানিনে। এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন নিশ্চয় তোদের ইস্কুল খুলেচে। তোদের শালবাগানের আষাঢ়ের নবমেঘ ঘনিয়ে এসেচে, তোদের জামগাছগুলোতে মেঘলা রঙের ফল ফলেচে, প্রান্তরলক্ষ্মী সবুজ রঙের আঁচল দিগন্তে বিস্তীর্ণ করে দিয়েচে, তোর বেণুকুঞ্জের সভাতে এস্রাজে মেঘমল্লারের সুর লেগেচে। আমি তো কিছুকালের জন্যে চলে এলুম, আমাদের আশ্রমের আনন্দ-ভাণ্ডারের চাবিটি তোর কাছেই রইল, সকালে বিকালে শিশুগুলিকে সুরের সুধা বণ্টন করে দিস্।

এবারে আশ্রমে চিঠি লেখবার লোকের অভাব নেই—খবর খুব বিস্তারিত রকমেই পাবি সন্দেহ নেই—আমি এবারে চিঠি লেখার সময় দিতে পারব না। সবুজপত্র যদি বেঁচে থাকে তবে তারই পত্রপুটে আমার লেখা দেখতে পাবি। যা কিছু অবকাশ পাই তর্জমা এবং বক্তৃতা লেখায় আমাকে লাগাতে হবে। এখন পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়েচি সুতরাং তোদের দিকে আমাকে পশ্চাৎ করতেই হবে।

কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল সুরু হল—ডেকে কোথাও শোবার জো রইল না। অল্প একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম, "শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে,"—তার পরে "বীণা বাজাও" তারপরে "পূর্ণ আনন্দ"—কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চল্‌ল—তখন একটা নতুন গান বানিয়ে গাইতে শুরু করলুম—শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি দেড়টার সময় ক্যাবিনে এসে শুলুম। গানটা সকালেও মনে ছিল (সেটা নীচে লিখে দিচ্চি। বেহাগ, তেওরা) তুই তোর সুরে গাইতে চেষ্টা করিস ত, আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখ্‌ব—ইতিমধ্যে মুকুলকে পিয়র্সনকে শেখাচ্চি। মুকুল যে নেহাৎ গাইতে পারে না তা নয়। সে জাহাজে খুব আসর জমিয়েচে।

তোমার ভুবন জোড়া আসনখানি
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা, দিনের রবি
আঁধার-আলোর সকল ছবি
তোমার আকাশ ভরা সকল বাণী
হৃদয়মাঝে বিছাও আনি।

তোমার ভুবন বীণার সকল সুরে
হৃদয় পরাণ দাও না পুরে।
দুঃখ সুখের সকল হরষ
ফুলের পরশ ঝড়ের পরশ
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
হৃদয় মাঝে দিকনা আনি।

আশ্রম বালকদের আমার আশীর্বাদ এবং বন্ধুদের আমার অভিবাদন। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

রবিদাদা

৮॥

Messageries
Maritimes

কল্যাণীয়েষু

পর্শু আমাদের এখানে দোল পূর্ণিমা গেছে—বিশেষ আয়োজন করতে হয়নি—দোলা দেবার ভার নিয়েছিল সমুদ্র আর পূর্ণিমার সরঞ্জাম ছিল আকাশে। ঐ পর্যন্ত। মনে পড়ল শান্তিনিকেতনের

সেই আমবাগান, আর শাল বীথিকা, আর গান আর সমস্ত ইত্যাদি। দূর থেকে দূরে চলেছি—মাঝে মাঝে ডেকে বসে কল্পনা করি আর একদিনের কথা, যখন ফেরবার খেয়া—ঘাট থেকে ঘাটে কাছের থেকে কাছে—অবশেষে একদিন সেই ভারতের তীরে দোলায়িত নারিকেল পল্লবের ইঙ্গিত। কত দিন পরে সেদিন তাও ঠিক জানি নে।

রথী ভালই আছে। কলম্বোয় নেমে অসুখ বেড়ে উঠেছিল তাই শেষ মুহূর্তে অনেক টানা-হেঁচড়া করে সুহৃদকে সঙ্গে নিতে হল। সে জাহাজে উঠে অবধি কেবলি নলিনী নলিনী চিন্তা করচে আর চমকে চমকে উঠচে -ভালো করে খবর নিয়ে জানলুম, সে হচ্চে নলিনীরঞ্জন সরকার—আশা করি কোনমতে তার মানভঞ্জন হবে। অমিয় ভালোই আছে—তার সঙ্গেই চলেছে তার সংসার। সংসারটি সর্বদাই প্রফুল্ল। আমি লিখে চলেচি বক্তৃতা।

নতুন গানেব বই ছাপতে দিয়ে এসেছি— একত্রে সব গান পুঞ্জিত হবে। তুই দেখে দিস যাতে প্রমাদ না ঘটে। খুব হাল আমলেব গানগুলো অনবধানে বাদ না পড়ে যেন। সেই জুজুৎসুর গানটা যেন অতলে তলিয়ে গেছে বলে বোধ হচ্চে। জুজুৎসুকদের সেটা শেখা উচিত। এই প্রবাসযাত্রীর কথা কমলকে স্মরণ করিয়ে দিস্। আজ সমুদ্র চঞ্চল। পরশু পৌঁছবে পোর্ট সৈয়েদ। ইতি ১৬ মার্চ ১৯৩০

রবিদাদা

বিদেশ থেকে দিনেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কার্ড

১ ॥

কাল ক্রিষ্টমাস। এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেচি। জায়গাটি সুন্দর—শান্তরসাস্পদ। এখানে এক সপ্তাহ কাটবে তার পরে যাব নিউইয়র্কে ফিরে। মনে মনে ভাবচি ভাগ্যবিধাতা আমার বনবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে তা হতোঽস্মি বলে দুঃখ করতুম না। বোধকরি নিয়ু ইয়র্কের থেকে অযোধ্যা সহরের অনেক তফাৎ ছিল। নইলে রাম ফিরতেন না।

(কার্ডের ছবি—A glimpse of the stable from the Road, Yama Farms)।

পোস্ট মার্ক

২৪.১.১৯২১

২ ॥

বিলিতি নববর্ষে চেঁচামেচি, মাতামাতি, খুনোখুনির বান ডাকিয়ে এল। এখানকার খবরের কাগজগুলো তার জয়ধ্বজা। শারদোৎসবের সন্ন্যাসীর মত আমি লক্ষ্মীর পথ খুঁজে বেড়ালুম, এসে পড়লুম লক্ষেশ্বরের ক্যাশবাক্সের সামনে--সে চেঁচাচ্চে—তেওয়ারি গিরধারীলাল।
(১৯২১-এরই বর্ষশেষের দিন হবে। চিঠিতে তারিখ নেই। ছবির বিষয়বস্তু—Fisherman's Hall Cottage at the Camp, Yama Farms)

৩ ॥

চিত্ত পিপাসিত রে
গীত সুধার তরে

এখানে অনেক ঘরবাড়ি, দোকানবাজার কলকারখানা, লোকলস্কর হাঙ্গাম হুজ্জুত; কিন্তু গানের উৎস খুঁজে পাচ্চি নে—ডলারের থলের তলায় চাপা পড়ে গেছে, বুঝতে পারচি সাঁচ্চা গানের দাম জোগাতে পারে এত বড় ব্যাঙ্ক এখানে একটাও নেই অতএব ধনান্ বজ্জয়ধ্বং ধনান বজ্জয়ধ্বং
(ছবি—On the Grounds of Yama Farms)

৪ ॥

ছবিটা ভাল করে দেখ,—কেরোসিন তেলের অন্ধকুপ এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠচে তেলের ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরদের এই দশা—এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সূর্যের আলো এদের মানসচক্ষে পৌঁছয় না। বলি রাজা পাতালপুরীর রাজা, তার বল হরণ করেছিলেন বামন অবতার। বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেচে। যারা এতকাল ছোট হয়েছিল, তারাই বড়র ধন হরণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েচে—বড় ভয়ে কম্পান্বিত, চারদিকে দুর্গ-প্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুলচে--কিন্তু দৈত্যভায়ার পাপের ধন আর টিঁকবে না।
(ছবি Flowing Oil Well, Shreveport, La—II)

৫ ॥

কবি-কাহিনী

When the evening steals on Western water,
Thrills the air with wings of homeless shadows ;
When the sky is crowned with star gemmed silence,
And the dreams dance on the deep of slumber ;

When the lilies lose their faith in morning
And in panic close their hopeless petals
There's a bird which leaves its nest in secret,
Seeks its song in trackless path of heaven.

কি ছন্দ বল্ দেখি ? একটা বাংলা ছন্দে লিখেছিলুম কিন্তু ইংরেজী ছন্দেও পড়া যায়।
(ছবি—Watermelon Jake। একটি নিগ্রো তরমুজ খাচ্ছে– কার্ডটি USA. Canada-র)

৬ ॥

দিনু,

আজ অপরাহ্নে এখানকার সমুদ্র পর্বত অরণ্যের উপর ঘন মেঘের ছায়া এসে জমেচে। তাই অনেকদিন পরে গানের বই খুলে "মেঘের পরে মেঘ' গানটা ঘরের কোণে গুনগুন করে ধরা গেল। তখন একটার পর একটা গান সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা পাখীর মত আমার কণ্ঠে আশ্রয় নিতে লাগল। ভুলে গেলুম কোথায় আছি। মনে হল যেন আশ্রমের আকাশ এখানে পর্যন্ত তার শ্যাম বসনাঞ্চল বিছিয়েছে।

রবিদাদা

OSLO 2. 10. 1926 পোস্ট মার্ক

৭ ॥

ত্রেতাযুগে তোদের সমুদ্রপারের যে কাহিনী শোনা গেছে তাতে জলস্পর্শ করতে হয়নি। এখন সেই পবিত্র লেজ খসে গিয়ে বিংশশতাব্দীতে বায়ুযানের আকার ধারণ করেচে—সেই অবধি বায়ুনন্দনের দর্পচূর্ণ হয়ে গেছে। যখন অতলান্তিকের চপেটাঘাতে আমাদের জাহাজ বিচলিত তখন এই কথা চিন্তা করছিলুম। যাই হোক তলিয়ে না গিয়ে পেরিয়ে এসেচি।

এখন তরঙ্গের আন্দোলন শান্ত হল রসনার আন্দোলন সুরু হবে তাতেও যথেষ্ট বায়ুবেগের প্রয়োজন আছে।

Santinikatan 2, Dec' 20 পোষ্ট মার্ক

৮ ॥

দিনকরকমলেষু

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েচে নিকট, এখন
জাহাজে চড়িতে হবে

উচ্ছল জল করে ছল ছল
তরণী পতাকা চলচঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।

Elgerburg,

(ছবি—কার্ডের ঠিকানা লেখার দিকে বাঁ কোণে লেখা আছে Thur, Wald)

৯ ॥

নিউ ইয়র্ক

আমি সর্বদাই প্রশ্ন করচি

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?

--

সোনার তরী যাতে শান্তিনিকেতনের পারে ভেড়ে এই আমার ইচ্ছে - কর্ণধার মুচকে হাঁসচেন। আপাতত নিয়ু ইয়র্কের ঘাটে বসে দোলা খাচ্চি। গান বন্ধ, যখন দেশের দিকে পাড়ি দেব তখন হয়ত হৃদয় তন্ত্রে দুটো একটা তান লাগতে থাকবে। গান নেই কিন্তু বক্তৃতা চলচে।

শান্তিনিকেতন
৭. ১২. ১৯২০ পোস্ট মার্ক

১০ ॥

আমরা প্যারিসে যে পাড়ায় ছিলুম তার চেহারা এই ছবিতে বুঝতে পারবি। চমৎকার জায়গা বড় আরামে ছিলুম। এখন যেখানে আছি এ হচ্ছে লণ্ডন, অন্ধকার, তার উপরে হোটেল। গান বন্ধ, প্রাণ ব্যাকুল—বিকশিত শেফালী বনের জন্য মন প্রতিদিন পাখা মেলে—খাঁচার দরজা খোলে না।

(ছবি—Saint Cloud—Le Pare—La Mare aux Biches).

শান্তিনিকেতন ২ নভেম্বর ১৯২০। পোস্টমার্ক

১১ ॥

পশ্চিমে অস্তাচলের প্রান্তে চুপ করে পড়ে আছি। পূর্বদিগন্তে উদয়াচল শিখরে রবির সঙ্গে দিনের যোগ হলে সঙ্গীত জেগে উঠবে—সেই কথা মাঝে মাঝে ধ্যান করতে বসি, এমন সময় দ্বারের ঘণ্টা

বেজে ওঠে, ভিজিটরের আবির্ভাব হয়—তার পরে, 'I am so glad to meet you. Do you mind our cold ? What do you think of America ? Is this your first visit ?'
(ছবি—The Camp—Seven miles from Yama Farms)

১২ ॥

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে লিখচি। আমাদের ভূগোল বিদ্যার মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারকে জিজ্ঞাসা করিস দেশটা বিশ্বজগতের কোন অংশে। প্রথমটা তার ধাঁদা লাগতে পারে অতএব সমস্যা সরল করবার জন্যে বলে দিচ্চি এখানকার রাজধানীর নাম Praha. তাতেও যদি ভূগোলের গোল আরও বেড়ে ওঠে তাহলে তাকে এখানকার ভাষার একটু নমুনা দিই—একটা শব্দই যথেষ্ট হবে—Srdce। দেখা যাচ্চে চারটে ব্যঞ্জন বর্ণের অনুবর্তী একটি মাত্র স্বরবর্ণ- যেমন পঞ্চপাণ্ডবের ছিল এক দ্রৌপদী। এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে এই মাত্র বক্তৃতা দিয়ে আসচি- সেখানকার সর্বাধ্যক্ষ এদেশের ভাষায় এক সুদীর্ঘ অভিনন্দন পাঠ করেছিলেন —তার থেকে আর কিছুই বুঝিনি, কেবল বুঝেচি যে, যদিও এদেশের স্বরবর্ণের দুর্ভিক্ষ তবুও বক্তৃতার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। মোকাবিলায় তার একটা ঘটনা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাবে। —যদি জিজ্ঞাসা করিস লিপিকায় নাম কেন প্রকাশ করিনে তার উত্তর হচ্চে অনামা পুরুষো ধন্যঃ নামে সকলেরই পরিচয় হতে পারে কিন্তু নাম না থাকলেও যার পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটেনি সেই হল সুপরিচিত।
(ছবি—A Pueblo water carrier near Albaquerque)

১৩ ॥

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে আকাশ নীল, সূর্যের আলো উজ্জ্বল, বাতাসে একটুখানি বসন্তের আমেজ লেগেচে, মানুষগুলোও একটু ঢিলে-ঢালা—কিন্তু কমলবনের গন্ধ পাচ্চিনে তাই হৃদয়বীণায় সুর লাগচে না। কেবল বক্তৃতা—গান নেই। আমাকে গান গাবার বায়না দিয়ে এই পৃথিবীতে আনা হয়েছিল। শেষকালে বক্তৃতার ফরমাস কেন ? আমার গলা যে ভাঙল। যখন ছুটি পাব তখন হয়ত সোনার হার মজুরা মিলবে—কিন্তু সে ত বরমাল্য নয়—সে কি মাথায় নিয়ে যাওয়া যায় ? এইমাত্র বক্তৃতা দিয়ে আসচি। হাততালির পর হাততালি তারপর হাত তালি।
(ছবি—Riverside Drive Waco, Texas)

১৪ ॥

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে আছি। মুক্তরাজ্যে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল। হোটেল বাতায়ন থেকে চারদিকে তাকাই, মনে হয় যেন সৌধমালার মরুভূমি—মরীচিকার অভিমুখে দলে দলে সবাই ছুটে

চলেচে। দেশের থেকে কিছু শান্তিবারির পাথেয় চিত্তের মধ্যে সংগ্রহ করে এনেছিলুম, সে প্রায় শুকিয়ে এসেচে—সেই আমার শূন্য কলস ডলার দিয়ে ভর্তি করলে কি তৃষ্ণা মিটবে? গান শুনতে ইচ্ছে করচে। কিন্তু সমুদ্রের ওপারেই গান এপারে কোলাহল

(ছবি—Torenstraat, Edam)

নিউ ইয়র্ক ১৩ ডিসেম্বর ১৯২০

শান্তিনিকেতন ১২ই জানুয়ারী ১৯২১ পোস্টমার্ক

১৫ ॥

কল্যাণীয়েষু

দিনু, তোরা কোথায় জানিনে, শৈলশিখরে না সমুদ্রতীরে না রাজধানীতে না শান্তিনিকেতনে। আমি আছি ঘূর্ণিপাকের পিঠে চড়ে। এখানে ওখানে এপারে ওপারে, এর বাড়িতে ওর বাড়িতে, এ সভায় ও সভায়, এখানে চায়ে ওখানে ডিনারে, এখানে জাহাজে ওখানে রেলগাড়িতে। মনের কম্পাসের কাঁটা নিত্যই রয়েছে উত্তরায়ণের সেই কোণার্কের দিকটাতে। লীলমণির আশ্রয়ে কবে আমার কেদারায় গিয়ে অধিষ্ঠিত হব এই কথা চিন্তা করচি।

ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৪ রবিদাদা

১৬ ॥

ভূগোলে এদেশ আমাদের দেশের উল্টো তলায় আর ভুয়ো-গোলে আমার এখানকার বাসা শান্তিনিকেতনের উল্টো পিঠে। আমার অবস্থা এর থেকেই বুঝে নে, অধিক বর্ণনা করবার শক্তি নেই, সময়ও নেই।

(ছবি—The Brooklyn Bridge)

নিউ ইয়র্ক ২০ নভেম্বর ১৯২০

শান্তিনিকেতন ১৮ ডিসেম্বর ১৯২১ পোস্ট মার্ক।

১৭ ॥

ফাগুন মাস পড়েছে, আমের বোল ধরেছে শালবনে কিশলয় দেখা দিয়েচে, আমলকি ঝরে ঝরে পড়চে, দখিন হাওয়া বেণুবন মর্মরিত করে তুলচে, কাঞ্চন বীথিকায় গাছে গাছে ফুল ফোটানোর পাল্লা দিয়েচে—এই সময় কোথায় আমি শান্তিনিকেতনের কোকিলদের সঙ্গে বসন্তবাহারে কবির লড়াই লাগাব—না, পায়ে জুতো মোজা, মাথায় টুপি গায়ে গরম কালো কাপড় পরে, টেকসাস্ সহরে সহরে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্চি। আমি সরস্বতীর কমলবনের রবি—আজ পশ্চিম গগনে এসে লোকহিতের কালো বনের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছি। উদ্ধার পাব কবে?

(ছবি—Scene in Cotton Palace Park, Waco, Texas)

কল্যাণীয়াসু,

কমল, তোমার চিঠিখানি পড়ে দুঃখ পেলাম। কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়া সহজ কথা নয়। চিরজীবন আমাদের মনের যে অভ্যাস সে আমাদের সংকীর্ণ সংসারে শত পাকে জড়িয়ে রাখে, যে মৃত্যু অনিবার্য তাকে স্বীকার করবার জন্য আমাদের লেশমাত্র প্রস্তুত রাখে না। ত্যাগের দ্বারা কল্যাণের দ্বারা পরম সত্যের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা মানব-জীবনের উদার স্বরূপকে যদি উপলব্ধি করি তাহলে সেই জীবনকে মৃত্যু পেরিয়ে দেখা সহজ হয়। নইলে ভোগ এবং আপনার প্রতি একান্ত মমতা যে সীমায় আমাদের বন্দী করে রাখে মৃত্যুর আক্রমণ সেখানে আমাদের সাংঘাতিক আঘাতে পীড়িত করে। পরম দুঃখের বেদনায় যতক্ষণ না আমাদের চৈতন্য আসে ততক্ষণ কোথাও আমরা শান্তি পাইনে যতক্ষণ জ্বালানি কাঠ থাকে ততক্ষণ আগুন জ্বলে--সে কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আগুন যায় নিভে—আপনাকে অত্যন্ত বেশি সত্য বলে আঁকতে থাকাই সেই জ্বালানি কাঠ। আমাদের এই আপন আজ জন্মায় কাল মরে, এ স্বভাবতঃই মৃত্যুর অধীন অথচ এরই উপর আমাদের সমস্ত ভালবাসা সমস্ত সুখ-দুঃখকে যদি পুঞ্জীভূত করি তাহলে জীবনের চরম ঝড়ে অর্থাৎ মৃত্যুতে যখন আমাদের নৌকাডুবি ঘটে তখন কিসে তাকে উদ্ধার করবে—হাজার কেঁদে মরি তখন শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পড়তেই হবে। কেননা, চিরজীবনই পরিপূর্ণ স্বরূপকে স্বীকার করতে পারিনি—শূন্যের উপরেই মায়ার ঘর বেঁধেছি, সেই মায়ার দেওয়াল হঠাৎ ভেঙে পড়লে শূন্য ছাড়া আর কিছু থাকে না। মৃত্যুকে ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারলে সে আমাদের বড়ো করে দেয়, আমাদের সঞ্চিত ময়লা ধুয়ে পবিত্র করে দেয়, মনে বৈরাগ্য আনে বলেই ত্যাগের দ্বারা কল্যাণ কর্ম সহজ করে দেয়—সেই তো মুক্তি, সেই তো আনন্দ। ব্যর্থ শোকের হাতে দিনরাত মার খেতে না চাও তাহলে আপনাকে ভোলবার সাধনা করো। সেই সাধনা হয় ত্যাগের দ্বারা, শুভকর্মের দ্বাবা, বিশ্বের সেবায় আপনার শক্তিকে উৎসর্গ করো, তাহলে যাকে ভালোবেসেছিলে তার ভালবাসাকে যথার্থভাবেই সার্থক করবে। তারই প্রতি ভালোবাসা তখন ভালোবাসার মহাসমুদ্রে উত্তীর্ণ হয়ে তোমার জীবনে পবিত্র তীর্থস্থানের স্থাপনা করবে। প্রতিদিন স্বার্থবিস্মৃত আসক্তিবিহীন নিরহঙ্কার কল্যাণকম সাধনের দ্বারা আমাদের অহং ক্রমশঃ পরাস্ত হয়, যে অহং আমাদের সকল দুঃখ সকল দুর্গতির মূলে। লোকখ্যাতি বা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে দৈনন্দিন সাধু কাজে আপনাকে উৎসর্গ করো—তাহলে মৃত্যুই তোমাকে অমৃতের পথে নিয়ে যাবে। আর এই মন্ত্রটি মনের মধ্যে যথার্থ করে জাগিয়ে তোলো শান্তং শিবং অদ্বৈতম্—অর্থাৎ যিনি পরমা শান্তি, যিনি পরম মঙ্গল, যিনি পরম এক তিনি সর্ব-দেশ সর্ব-কাল পরিপূর্ণ করে আছেন—তাঁরই মধ্যে সব আছে, সবাই আছে, জীবনে-মরণে তাঁর মধ্যেই আমাদের গতি, তিনিই আমাদের পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ—আপনাকে যতই ছাড়বো, যতই ভুলবো ততই তাঁকে পেতে থাকবো। ইতি—১৩ই মাঘ ১৩৪২।

রবিদাদা

(দিনেন্দ্র-পত্নী কমলা দেবীকে লেখা। "বঙ্গলক্ষ্মী" ভাদ্র ১৩৪৮ থেকে গৃহীত)

শ্রী কমলা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথ

১৯১৪ সালে রামগড়ে ববীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দিনেন্দ্রনাথ

শিল্পাচার্য নন্দলালের সঙ্গে পৌষ মেলায় দিনেন্দ্রনাথ

দিনেন্দ্রনাথের চিঠি

১ ॥

ওঁ

এডেন উপসাগর

মঙ্গলবার

শ্রীচরণেষু

ন এবং ছোটকাকীমা, বাপরে প্রাণ গেল এক মামুলি সমুদ্র দেখে দেখে আর বাঁচি নে একটা পাখীও নেই

নাহি ঘাস নাহি তরু
নাহি বাড়ি নাহি মরু
নাহি পক্ষী নাহি গরু

(অবশ্য জ্যাম নেই কারণ মৃত এবং পক্ক খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে) এই তো অবস্থা। আজকের সমুদ্রটা একটু ঠাণ্ডা। এই চারদিন যা কষ্ট হয়েছিল সে আর কি বলব। প্রচণ্ড ঢেউ তার সঙ্গে প্রচণ্ড দোল, প্রথম দিন যেমন একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে জাহাজটাকে দুলিয়ে দিলে অমনি আমার বুকটা দুরদুর করে উঠল, যা হোক এখন সয়ে গেছে।

আমার চারদিকে রাঙা জুড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমিও মনে মনে ওদের বলচি "আমারও আছে হে আছে অত জাঁক কেন ?"

কাল রাত্রে ডিনারের পর সব মেম এবং সাহেবরা আমার এসরাজ বাজনা এবং গান শুনতে চাইলে। কি করি অগত্যা ডাক ছেড়ে আরম্ভ করে দিলুম। সে যে হাসি আরম্ভ হল সে আর কি বল্‌ব। হেসে কে কার গায়ে পড়ে।

খাবার দাবার বেশ সুবিধে ভাত কারি পাওয়া যায় এবং নানাবিধ ফল। কেবল কাপড় ছাড়তে ছাড়তে প্রাণ গেল। রাত্রে আবার evening dress না পরলে চলবে না, এমন বিপদে কি মানুষ পড়ে ? যা হোক এখানেই শেষ করা যাক অনেক চিঠি লিখতে হবে। তোমরা আমার প্রণাম জেনো এবং রমা বেঙ্ খোকা ইত্যাদিকে বেশ করে গলা জড়িয়ে ধরে যতক্ষণ না আঁ ছাঁড়ো না করে ততক্ষণ ধরে চটকে হামি দিয়ে দিও।

ইতি

তোমাদের স্নেহের দিনু

(সুধীন্দ্রনাথের পত্নী চারুবালা দেবী ও ঋতীন্দ্রনাথের পত্নী সুকেশী দেবীকে লেখা। সময় সম্ভবত ১৯০৪)

২ ॥

জোড়াসাঁকো
৪ঠা বৈশাখ

কল্যাণীয়াসু

মুটু, তোর পত্র যথাসময়ে পেলুম। খুকুর এখানে খোঁজ নিয়েছিলুম, বোলপুরে আছে জানতুম না। বাসু কলকাতায় এসে কি সেবাসদনে যাবে? যদি যায় তো কমল দেখা করতে যাবে। আমি এখানে এসে ভালই আছি। কয়দিন বেশ ঠাণ্ডা ছিল, কাল থেকে ঘাম ঝরিছে অবিরাম, রোদের উত্তাপও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

ওখানে আমার বহু যত্ন-বর্ধিত গাছগুলো বৃষ্টিতে সতেজ রয়েছে জেনে সুখী হলুম। এ যেন ঠিক বিলাতী ছেলে মানুষ করার মত হয়েছে। বড় হয়েছে এখন করে খাও গোছের ভাব, ফুলগুলো মাটিই নেবে, তোকেও নেবে আমাকেও নেবে। আগে-পিছে এই যা তফাৎ। বুড়ি এখন আমাদের স্মরণ করাটাও অপ্রয়োজনীয় মনে করে, খবরই দেয় না ভালো। কিছু বলিস্ নে তাকে। তোর ছেলে দুষ্টুমিতে দিন-দিন উন্নতি লাভ করচে জেনে খুশী হলাম। এ-কাল ম্যাদামারা ছেলের কাল নয়। ডানপিটে হওয়াই দরকার।

খুকুকে বলিস্ তাকে ভুলি নি। এই সঙ্গে ঝুনু যে স্বরলিপি দুটো পাঠিয়েচে তা খামবদ্ধ কর্‌লুম, তোর সমোপাধি সুধীরকে সমর্পণ করিস্। একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌চি, সুরেন কি আমাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল? যদি দিয়ে থাকে কত দিয়েছিল পত্রপাঠ জানাস্ ফেরৎ দেব। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিস

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রমা করকে লেখা)

৩ ॥

ashantuli
Darjeeling
18. 5. 31

কল্যাণীয়াসু

বুড়ি থুরথুড়ি, তোর চিঠি পেয়ে খু-উ-উ-উ-উ-ব খুসী হয়েছি। তা হলে গরমটা একেবারে পেট ভরে ভোগ করলি দেখচি। তোর মা হয়ত মাথা চাপড়াচ্ছেন আর মালঞ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় সুরে ভাদুড়ি-জড়িত কণ্ঠে বলচেন "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।" তুই আর লুলু গাড়ি চালাতে শিখেছিস্ শুনে আমি অন্তত একটুও আনন্দিত হইনি। আমি নেবে গেলেই তোরা দুজনে আমাকে জ্বালিয়ে মারবি বেশ বুঝতে পারচি। আমি খুব কড়া হব; আমার গাড়ি হাঁকাতে চাইলে আমি এমন হাঁক ডাক সুরু করব যে হাঙ্গোরিয়ান Father-motherরা ছুটে এসে তাদের

নৃত্যোপযোগী গান হচ্চে ভেবে মাটি ঝাঁটাতে আরম্ভ করবে। আমরা ৬ দিন পরে নেবে যাচ্চি তাই এখন তোর স্বরলিপি পাঠালুম না, গিয়েই লিখে দেব। তাছাড়া হাতের কাছে বই নেই। হ্যাঁ ভাল কথা শুভেন্দুকে বলিস Petrol ঢেলে গাড়িটা Start করতে, না হলে হয়ত গিয়ে দেখব Battery work কর্চ্চেনা। বিশেষ করে বলে দিস।

আমাদের এখানে এখন বর্ষার পালা সুরু হয়েছে। বায়ুসেবী সমাগত ভদ্র অভদ্র সবাই হুড়মুড় করে নেবে যাচ্চে, পথ জনহীন, আঁধারে বিলীন মোরা গুনি দিন এক দুই তিন, হয়ে মোটরে আসীন, করে তাধিন তাধিন যাব গুড়ি গুড়ি শিলিগুড়ি, তার পর প্রান্তর বোলপুরী আছে লালু আছে বুড়ি, গোবিন্দ চৌধুরী কত বালা আর চুড়ি পরা মেয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি। মহাপ্রভু গিয়ে অবধি কোন খবর দেয়নি। জারম্যানদেব দলে ভিড়ে কালাম্যানদের ভুলে গেছে বোধ হয়।

তোব মাকে বলিস নুটুদের ফুলসজ্জা একদিনে শেষ হয়ে গেল কিন্তু এখানে গিরিজার চির-ফুলসজ্জার অপূর্ব বর্ণ বৈচিত্র্যের দৃশ্য যত দেখি তৃপ্তি আর কিছুতেই হয় না। তোদের ওখানে গন্ধ গানেব মিলনলীলা, এখানে শুধু বর্ণের সমারোহ। গানের মধ্যে এখানে আছে ভুটিয়াদের উদ্ভুট্টি চিৎকাব। শুনলে মনে হয় হজমিগুলি খাইয়ে দিই। ভুট্টা খেয়ে পেট কামড়াচ্চে। আজ তবে আসি। ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিস

দিনদা

৪ ॥

কল্যাণীয়াসু বুড়ি, তোর লম্বা চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলুম। অনেক খবর তোর চিঠিতে পেলুম, তার জন্য ধন্যবাদ।

আমরা ১৫ই নামব। এখানে সকালে বৃষ্টি, দুপুরে বৃষ্টি, রাত্রে বৃষ্টি। স্বপনে বৃষ্টি। প্রাণ আইঢাই করচে আর পারি না।

আমাব চিঠির সঙ্গে সাবিত্রী তোকেও লিখেছিল, সেটা এসেছে, পাঠাচ্চি :

তা হলে ক্ষিতিবাবুব 'তিনকন্যাদান' হয়ে যাবে। এক কন্যা এখানে 'রাঁধেন-বাড়েন,' এক কন্যা লক্ষ্ণৌতে বসে কাবাবরুটি খান, কিন্তু শেষটি গোসা করে বাপের বাড়ি যেন না যান। কি বল ?

প্রশান্ত লিখেচে যে সে আমাকে চিঠি লিখেছে। হরি, হরি। লুলুও বলবে চিরুর চিঠি পায়নি। এর সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড় শক্ত। প্রমাণ নেই। আমি যদি বলি চিঠি পাইনি। তাহলে প্রশান্ত বলবে "ওই যাঃ নিশ্চয় দুর্বৃত্তেরা ডাকবাক্স পুড়িয়ে দিয়েছে।" আর লুলু বলবে "নিশ্চয় ভুল, চিরু ভুল ঠিকানা দিয়েছিল তাই চিঠি পাই নি।" দুজনে বেশ সড় করেছে তো। আর তো কদিন পরেই দেখা হবে তখন সব কথা হবে। আজ আসি ভালবাসা জানিস। ইতি

দিনদা

৫ ॥

শান্তিনিকেতন ২৩এ এপ্রিল

কল্যাণীয়াসু,

বুড়ি তোর চিঠি পেলুম কলকাতায় আর জবাব পাঠাচ্চি বোলপুর থেকে। আছিস কেমন? এখানে কবে আসবি?

"ঋতুরঙ্গ" হল বটে কিন্তু সে অপরূপ রঙ্গ দেখে হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারলুম না। নৃত্য যা হল St Vitus dance বলা চলে; গান যা হল তাতে সুরের চেয়ে মুখভঙ্গীব প্রাচুর্ভাব বেশী ছিল।

শান্তিবাবুর অজন্তা নৃত্য হল কিন্তু অমিতা সেন হঠাৎ গা ঢাকা দিলেন, বস্ত্র বিক্রেতাবা আশ্বস্ত হয়, অলঙ্কার শিল্পীরা heaved a sigh of relief এবং আমাদেব উদরের অন্ন সহজে পরিপাক কবার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি এমনকি পরদিন প্রাতে বহির্গমন পথে কোন বাধা উপস্থিত হয়নি। কাগজ-ওয়ালারা বিস্তারিতভাবে নৃত্যের ব্যাখ্যা ও প্রশংসা করবার জন্য কলম উঁচিয়ে ছিল। কিন্তু

চলিল কলম উঁচিয়া
স্বগৃহে অশ্রু মুছিয়া
উৎসাহ গেল ঘুচিয়া

বুবু, সঞ্জীব এখানে আছে। বুবু খুব উৎসাহে কাজে লেগেছে; কলাভবনের মাসিমার মত??? ঘুবে বেড়াচ্চে তাই "Kestos" এর ব্যবস্থা করেছি। আজ তবে আসি। Remind me to your father। ভালবাসা জানিস।

ইতি
দিনদা

(৩, ৪, ৫ নং চিঠি মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতাকে (কৃপালনী) লেখা)

৬ ॥

Asnantuli
16. 6. 31

কল্যাণীয়াসু,

বুটু, তোর চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। আমাদের মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী। এখানে নববর্ষার ডমরুধ্বনি শুনে মহাদেব অর্থাৎ গুরুদেবের অন্তরে তাণ্ডবনৃত্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তিনি ভাব্‌চেন শান্তিনিকেতনের নবঘনশ্যাম সজলবার্তা বহন করে শৈলশিখরে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পত্র যে বার্তা বহন করে আন্‌চে তাতে নিরুৎসাহ হয়ে নন্দী ভৃঙ্গী আমরা বুঝিয়ে বলে তাঁকে কথঞ্চিৎ শান্ত করতে পেরেছি এখন, কিন্তু দুচারদিনের মধ্যেই শান্তিভঙ্গ হবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নেই। এখানে মৃণালভুজারা নটীর পূজা করবার জন্যে কোমর বেঁধে এসেছিলেন। দু'একজন রৈবিক

(অর্থাৎ রেবার মত) এমন অঙ্গভঙ্গী করলেন যে হাতের কাছে ডাক্তার থাকলে নিশ্চয়ই বলত ধনুষ্টঙ্কার হয়েছে ; সঙ্গে সঙ্গে "এস নীপবনে" গীতঝঙ্কার এমন বিচিত্র সুরে ও তালে সুরু হল যাকে ভদ্রভাষায় আর্তনাদ বলা চলে। মেনকা (হেমমাসিমা বলেন ম্যানকা) "জানি জানি হল যাবার আয়োজন" গাইলে, তা শুনে মনে হল "যাবার আয়োজন" করলে ভালো ছিল "গাবার প্রয়োজন" ছিল না।

খুকুর চিঠি দু একখানা পেয়েছি। সাবিত্রী হঠাৎ মদ্রদেশীয় ঢঙের ইংরাজিতে লম্বা পত্রাঘাত করেছিল। সে লিখেছিল নুটুদির বিয়ে শুনে আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করচে। আমি তার উত্তরে তাকে লিখেছি সেটা চট্ করে করে ফেলতে, কেননা ইচ্ছাটা জুড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। সে লিখেছে দার্জিলিঙ্ থেকে তার জন্যে ভাল জিনিস কিছু আনতে। আমি তাকে লিখেছি তার বর্তমান মানসিক অবস্থায় সব চেয়ে যা পছন্দ হবে তা এখানে আমি জোগাড় করতে অক্ষম ; যদি বা জোগাড় করতে পারি, তার অঙ্গ সৌরভ সাবিত্রীর নাকের ভিতর দিয়া উদরে প্রবেশ করে সুদূর অতীতভুক্ত মদ্রদেশীয় অন্ন উৎসের ন্যায় উৎসারিত হবে।

রবিদাদা, রথী খুব ভাল আছেন। আমরা অর্থাৎ রথী, খুড়ি পুপে ছাড়া সকলে ২৫এ তারিখ নাম্‌ব। জুলাইয়ের প্রথমে আশা করচি নবদম্পতির নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহে অতিথি হয়ে আশীর্বাদ করবার অবসর আমার হবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রমা করকে লেখা)

৭ ॥

Bamboo Grove
Kalimpong D. H. Rly
2. 6. 28

তোমার পত্র ও কবিতা পেয়ে আনন্দিত হলুম। এ আনন্দ কিন্তু একেবারে অবিমিশ্র আনন্দ নয়, কারণ পড়ে একটু দুঃখও যে হয়নি তা হলপ্ করে বলতে পারি না। আমার স্মৃতিশক্তির প্রতি তোমার এত অবিশ্বাস কেন ? এই সেদিন তোমাকে দেখলুম আর এরই মধ্যে ভুলে যাব ? বয়স হয়েছে স্বীকার করি কিন্তু এখনও একদিনে পাঁচ সাতটা গান শিখে অনায়াসে মনে রাখতে পারি, বুঝেছ ? তুমি মনে মনে ভাবচ 'লোকটা কি জেঁকো, এমন করে নিজের শক্তির বড়াই করে'। কিন্তু কি করব বড়ই ব্যথিত হয়ে যা কখনো করিনা এমন অপরাধও করতে হোলো, নিজগুণে ক্ষমা কোরো।

সুর দিয়ে স্বরলিপি করে পাঠালুম। পরের গানে সুর দেওয়া বড় কঠিন কাজ, জানিনা কতটা কৃতকার্য হলুম। সুরটা যদি তোমার মনোমত হয় ত খুবই সুখী হব। আশা করি তোমরা

সকলে ভাল আছ। তোমার পিতাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দিও, তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি—

শুভাধ্যায়ী
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ ॥

Stephen Mansion
10. 6. 32

কল্যাণীয়াসু,

মৈত্রেয়ী

লিখেছ দু এক ছত্র
নাতিদীর্ঘ এক পত্র
পেয়ে খুসী হয়েছি অবশ্য।
জবাবে লিখিব মস্ত
চিঠি, তাতে নই অভ্যস্ত,
জানই তো অগাধ আলস্য
বাঁধিয়া কোমরবন্ধ
মিল খুঁজি গাঁথি ছন্দ,
কবি তুমি, কোরো না তা তুচ্ছ
করিও কৃপা কটাক্ষ
কবি এ অধম আখ্য
ভেবো কৃপা দীনেরে বিলুচ্ছ।
নগাধিরাজের বক্ষ
জুড়ি থাক্ যক্ষ রক্ষ
মোরা পলায়ন লাগি ব্যগ্র।
সারাদিন বৃষ্টি-বৃষ্টি
এ যে বড় অনাসৃষ্টি
ঢের ভালো গরম উদগ্র।
স্বর্গ চেয়ে ভালো মর্ত্য,
গরমেতে কে বা মরত
পুরাকালে বল দেখি মৈত্রী!
সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা

ধড়েতে রাখিত প্রাণ্‌টা
পানে দিত জায়ফল ও জৈত্রী।
বন্ধু সবে দিল লম্বা
দেখাইয়া কাঁচা রম্ভা
একা হেথা রহিব কি জন্য ?
অশ্রু নামে বাহি গণ্ড
শোকাবেগ কী প্রচণ্ড
আমি ছাড়া কে বুঝিবে অন্য।
"নামিব আগামী হপ্তা"
এই মন্ত্র হল জপ্‌তা
হরষে বাহিব করি দন্ত।
মহানগরীতে ঢুকি
হব Lansdowne-মুখী
ভাবনা কী, আছে দুই বোন্‌ তো।
আজ তবে টানি দাঁড়ি
কলম বদের ধাড়ি
মসী শুষি খাইল সমস্ত,
যথা ঐ লম্বা দাড়ি
চাচা, যে চালায় গাড়ি
দোকানেতে খায় গরু-গোস্ত॥

দেখো হুড়মুড় করে কত বড় চিঠি লিখলুম। তোমরা স্নেহাশীর্বাদ জেনো, বাবা, মাকে নমস্কার দিও। ইতি

তোমাদের
দিনুদা

৯॥

মৈত্রেয়ী

পঞ্চ পাণ্ডবের তরে রাঁধিলা দ্রৌপদী ;
তারি গুণগান গাহি রচিলা চৌপদী
দ্বিপদ রসিক কবি। এই কলি যুগে
অম্লশূল বেদনায়, ম্যালেরিয়া ভুগে
আহার কাহার বলো আছে সেই মতো ?
যত খায় পিঠেপুলি সোডা খায় ততো।

শুকতুনি ঝোলভাত বড়জোর চপ্
দুখানা লুচির সাথে চা দু এক কপ্,
তার সাথে দুই সন্ধ্যা হরিনাম জপ্—
তারপরে সেই অন্তিম ফুল্‌স্টপ্।
যেই কটা দিন তাই থাকি ধরাধামে
খাই পেট ভরে আর ভজি সীতারামে।
ভজনা ও ভোজনের আয়োজনে ভাই
আমন্ত্রণ লিপিখানা তোমারে পাঠাই

১০ নয়, ন তারিখ
রবি নয় সোম
ষ্টিফেন বারিক
ফ্ল্যাট অষ্টম

দিনেন্দ্র

১০ ॥

মৈত্রেয়ী

পিঠেগুলি ছিটেফোঁটা শুধু এক রত্তি
ভাবিনু পাঠালে বুঝি। ওমা, কী বিপত্তি!
দোঁহে মিলি খাব কতো? খাইতে আপত্তি
করি নাই। নিশ্চয় দানব কি দত্যি
আখ্যা লাভ হোতো যদি দেখে যেতে, সত্যি।
খেয়ে নিই, আছে পরে রোগ আর পথ্যি।
খেতাব তোমারে দেব ভাবিয়াছি চিত্তে,
সেরা দেব কেহ পরে পারে নাকো জিত্‌তে।
বোসো ভাবি। দিই যদি রন্ধনাচার্য
তবে ক্রোধে জ্বলে ওঠা সে যে অনিবার্য।
আশা ছাড়ি আশীষিনু লভ ভালো বর
সুদর্শন হৃষ্টপুষ্ট খাইয়ে জবর।
উদরের পথ বাহি হৃদয়ের দ্বার
হইবে নিমেষে উন্মুক্ত উদার।

মিষ্টতুষ্ট
দিনুদা

(৭, ৮, ৯, ১০ সংখ্যক চিঠি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে লেখা)

দাঁড়িয়ে ঃ রমা দেবী (সুধীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা), দিনেন্দ্রনাথ, কমলা দেবী
বসে ঃ মীরা দেবী, নীতীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী
মাটিতে ঃ এনা দেবী (সুধীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা)

ছবি ঃ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সৌজন্যে।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী উৎসব
১২৮১ - ১৩৮১

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী শোভাযাত্রা। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮২

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী উৎসব। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণণ
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮২

১১ ॥

6/3 Dwarakanath Tagore Lane
8/4/35

ওগো অমলা দত্ত,
চিঠি লেখা বন্ধ কেন, এর কিবা অর্থ ?
দিই নি জবাব ?
কুঁড়েমি কবা যে চিরকালের স্বভাব।
দয়া করে কোরো ক্ষমা
মোরে নিরুপমা !
কুনাল দাদারে পেয়ে পুবাতন দাদা
দূরে দিলে ঠেলে ফেলে যেথা ছাই-গাদা !
ভাব কি কুইনি
কমলা খাবার কালে আঁখি জলে তাহাবে ধুইনি ?
অত নরাধম
ভাব যদি মরিব যে বাহিরিয়া দম।
হেথা কী গরম !
হোথা আছে মন্দবায়ু স্নিগ্ধ মনোরম।
রুধিয়া দরজা ফেলি খসখসে টাটি
মাটি পবে বিছায়েছি শিলেটের পাটি।
গোপাল বেহারা সদা দাত্রখানা তুলি'
ডাবের উড়ায়ে দেয় মস্তকের খুলি।
তুমি হোথা খাচ্চ বেড়ে পেস্তা আলুবোখ্‌রা
মোটারে মোখাবে যাও, নয় লাইমোখ্‌রা।
কমলের হৃদ্ যন্ত্র হয়েছে বিকল
বেরি-বেরি হাঁপানির এই শেষ ফল !
আজও শয্যাগত
শুশ্রূষার তরে nurse লেগে অবিরত।
দুর্ভাগ্য একেলা নাহি আসে,
যথা গরুর গাড়ির সার jettyর সকাশে।
বুড়ি দিল তুড়ি লাফ পারাবার পারে
এবারে

লালমুখো সাথে বুড়ি ফিরিবে স্বদেশে,
বিবিয়ানা বেশে
হাইহীল খটমটি যাবে বোলপুরে!
চেঁচাবে কুকুরে,
কলেজের প্রফেসার চা খাবার আশে
মালঞ্চ আবাসে
নিত্য দেবে হানা,
শান্তি গাহিবে গান তোম্ তা না নানা।
আজ Good bye
চিঠি যেন পাই।
অনেক স্নেহাশীর্বাদ।

শুভার্থী
দিন্‌দা

Sreematee Amala Dutta
C/o Rai P. C. Dutt Bahadur CIE
Executive Councillor
Shillong
Assam

কুণাল সেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর ভাইপো।
হোথা—শিলং
বুড়ি—নন্দিতা

১২ ॥

শান্তিনিকেতন
২০ এ পৌষ ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু

অমিয়া, তোমার চিঠি যখন পেলুম তখন নানা ব্যাপারে আমি জড়িয়ে ছিলুম যে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিতে পারিনি। কিছু মনে কোরো না।

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ ও দুঃখ দুই-ই পেলুম। তুমি এখানে থাকতে তোমাকে দেখেই বুঝতুম যে কী একটা বেদনা সর্বদা তোমাকে পীড়িত করচে, তোমার আকৃতি ও প্রকৃতিতে তার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। অনেকবার এর কারণ অনুসন্ধান করার ইচ্ছা মনে জেগেছিল, সাহস করি নি। কুইনির কাছে তার কিছু আভাস পেয়েছি, পেয়ে বেদনা কম পাইনি।

যা হোক, তুমি বাবা মার কোলে আনন্দে আছ জেনে সুখী হলুম। কুইনি ঝুলি বড় কম ভরে নিয়ে যায় নি। তার কাছ থেকে সব আদায় কোরো। তোমরা কাছে আসো আবার দূরে চলে যাও আমাকে একা ফেলে, দুঃখ করি বটে তার জন্যে কিন্তু এই তো সংসারের নিয়ম। বৈরাগ্যের ভাব মনে জাগাতে চেষ্টা করি কিন্তু চোখের জল ফেলাটা আমার পক্ষে ঢের বেশী সহজ; তাও পারৎপক্ষে ফেলি না চেপে যাই।

আমার একমাত্র জীবন পথের সম্বল তোমাদের সঙ্গে প্রীতির বিনিময়, সে প্রীতিবন্ধন অটুট থাকুক এই আমার একান্ত বাসনা। মাঝে মাঝে তোমাদের কুশল সংবাদ পেলে সুখী হব। স্নেহাশীষ জেনো।

ইতি

দিনদা

শ্রীমতী অমিয়া দেবী
C/o Rai Promode Ch. Dutt Bahadur CIE
Member Council of State
Syllet

১৩॥

6 Dwarkanath Tagore's Lane
Jorasanko
Calcutta

অমিয়া অমলা
পাইয়া কমলা
লিখিছে কমলাকান্ত
দ-এ হ্রস্ব ই—ন এ কার,—ন এ দ এ রফলা,
বিফল জীবন মম হল আজি স-ফলা
দলিয়া কমল-করে
রস লয়ে সমাদরে
দিল যবে করিবারে পান,
আমি তাহা ঢালি মুখে
মেরে দিনু এক চুমুকে,
আনন্দে হইনু চিৎ মুদি দু'নয়ান।
মনে পড়ে বোল কথা,
ছোটো ঘরে সমাগতা

ছুটি বোন সহাস্য বদন
করিত গীত-অমৃত-বারিধি মথন।
হা হতোস্মি কোথা ঘর, কোথা গেল গান!
ধোঁয়া ঢাকা সহরেতে এবে অবস্থান।
নাহি হাসি নাই গল্প,
রস প্রাণে ছিল অল্প
তাও যে শুকায়ে গিয়ে হল মরুভূমি।
কোথায় রহিল বুড়ি, অমলা কোথায় গেলে তুমি।
মনো দুখে আজি দিন্‌দা
অদৃষ্টেরে করে নিন্দা,
কোরে কিন্তু হবে কী বা বল্‌,
কাক যেন ঠোকরায় মিছে বিম্বফল।
মিল গাঁথা ছাড়ি
এইখানে দাঁড়ি
দিনু তবে টানি।
শতবর্ষ জিও,
এই শুভাশীষ নিও,
লিখিনু কেমন পত্র, বড় কতখানি!

শুভার্থী
দিন্‌দা

Sreemati Amala Dutta
C/o Rai P. C. Dutt Bahadur CIE
Executive Councellor Shillong Assam

দিনেন্দ্রনাথ : জীবন ও সাধনা

বারিদবরণ ঘোষ

তাঁর আদরের নাতিটির সহজাত সংগীত-প্রতিভা এবং নাট্যচেতনা লক্ষ্য করেই 'ফাল্গুনী' নাটকটি দিনেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে সেই বালকদের সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম।

দিনেন্দ্রনাথের আরও বহু পরিচয়ের মধ্যে এর পর থেকে ঐ দুটি বিশেষণ- 'নাটের কাণ্ডারী' ও 'গানের ভাণ্ডারী' বিশেষণ দু'টিই তাঁর মুখ্য পরিচয়ের বাহন হয়ে গেছে। অথচ এর অতিরিক্ত নানা বিচিত্র গুণে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন গুণান্বিত। দিনেন্দ্রনাথ তাঁর জন্মশতবর্ষে পৌঁছে গেছেন। এই স্মরণ-লগ্নে তাঁকে এই বিচিত্ররূপে দেখার একটা অবকাশ এখন সমুপস্থিত।

২ ॥

আমার প্রায়ই মনে হয়েছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যেন একটি স্বশাসিত সমাজ। এই সংস্কৃতিমান পরিবারে দিনেন্দ্রনাথের জন্ম বাংলা ২ পৌষ ১২৮৯, ইংরেজি ১৬ ডিসেম্বর তারিখে। পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ এবং স্বয়ং দার্শনিক-কবি।

পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথকে উইলিয়ম পিয়র্সন সম্ভ্রমমিশ্রিত কৌতুকে ডাকতেন Maharaja of Santiniketan বলে। সেই আভিজাত্যের সঙ্গে মিশেছিল একটা মজলিসি সত্তা—পুত্র হিসেবে যেটি দিনেন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথের মায়ের পরিবারও অভিজাত। বরিশালের লাখুটিয়াবংশের জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরীর কন্যা সুশীলা দেবী তাঁর মা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুখ্যাত জীবনীকার দেবকুমার রায়-চৌধুরী তাঁর মামা ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ যখন আট, তাঁর ছোট বোন নলিনী যখন মাত্র ছয়, তখন সুশীলা দেবীর মৃত্যু ঘটে। দ্বিপেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন রাজা রামমোহনের বংশাগত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হেমলতা দেবীকে। হেমলতা দেবী শান্তিনিকেতনে 'বড়মা' নামেই সবিশেষ পরিচিত। তিনি যে দিনেন্দ্রনাথের বিমাতা, তাঁর আচরণে একথা কোনোদিনই ধরা পড়ত না।

৩ ॥

খুব ছোটবেলায় কাশিয়াবাগান স্কুলের পাঠ সমাপ্ত হলে দিনেন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দেওয়া হল কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। কিন্তু ভয়ানক দুরন্ত দিনেন্দ্রনাথ। প্রায়ই বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ অভিযোগপত্র পাঠান দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছে। প্রচুর প্রহার করতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ। কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের অবাধ্যপনায় ঘাট্‌তি ঘটত না। বড় হয়েও তিনি এই অভ্যেস ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে দিনেন্দ্রনাথ চিৎপুরের মসজিদের মুসলমানদের রাখী পরাতে গিয়েছেন শুনে দ্বিপেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে দারোয়ান ডাকতে আরম্ভ করেন। পাছে, দিনেন্দ্রনাথ একটা মারামারি বাধিয়ে বসেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া'তে এর একটা মনোরম চিত্র এঁকে গেছেন।

সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে তাঁকে সরিয়ে এনে ভর্তি করে দেওয়া হয় সিটি স্কুলে। এখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনের পরবর্তীকালের বিখ্যাত অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে পান। এই স্কুল থেকেই দিনেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে এন্‌ট্রান্স পাস করেন। এবারে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এসসি. পড়তে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আই. এসসি. পরীক্ষা দেওয়া হল না।

৪ ॥

এর কিছুদিন পরে তাঁকে পাঠানো হল বিলেতে। উদ্দেশ্য তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরবেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এর কিছুকাল পরেই দিনেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন স্বদেশে—সম্ভবত মহর্ষিদেবের মৃত্যুর (১৯. ১. ১৯০৫) কারণে।

এ সময়ের বাংলা দেশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আলোড়িত। দিনেন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়লেন এর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করতে লাগলেন। পরিয়ে দিলেন রাখী জাতিধর্ম নির্বিশেষে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার গেলেন অসমাপ্ত ব্যারিষ্টারি পাঠ সমাপ্ত করার মানসে। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই ফিরে এলেন পুনশ্চ। দুবার বিলেত গিয়েও কেন পরীক্ষা দিলেন না, বহুজনের কাছে এ প্রশ্ন করেও এর সদুত্তর পাইনি। তাঁর প্রিয় শিষ্যা অমিতা সেন (খুকু) অবশ্য লিখে গেছেন—'শুধু ভারতীয় সংগীতেই নয়, ইউরোপীয় সংগীতেও দিনেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল। বিলাতে এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হয়েই তাঁর ব্যারিষ্টার হওয়া আর ঘটে ওঠেনি।'

৫ ॥

এরই মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ বিবাহিত হয়েছেন। রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর কন্যা বীণাপাণি দেবীর সঙ্গে সতেরো বছরের দিনেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

অনতি কালের মধ্যে তাঁর স্ত্রী 'বীণা'— এই সংক্ষিপ্ত নামেই পরিচিত হন। বীণা দেবী হলেন বড়মা হেমলতা দেবীর ভাইঝিও এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী সুনয়নী দেবীর কন্যা।

অল্প বয়সেই ডিপথেরিয়ায় বীণাপাণির মৃত্যু হলে দিনেন্দ্রনাথের কুড়ি বছর বয়সে দ্বিতীয় বধূ হয়ে আসেন জোড়াসাঁকোর বাড়ির নিকটবর্তী মদন চ্যাটার্জি লেনের বাসিন্দা ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা পূর্ব পরিচিতা কমলা দেবী।

কমলা দেবী এক চমৎকার মহিলা ছিলেন। শান্তিনিকেতনের অন্দরমহলের সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ীর যোগ। 'আলাপিনী সমিতি'র মধ্যমণি কমলা দেবীর বাড়ি নারী শিশু এবং অভ্যাগতদের জন্য সর্বদা উন্মুক্তদ্বার ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভালবাসতেন এই আদরের নাতবৌটিকে। একটু একটু লিখতে পারতেন তিনি 'শ্রেয়সী' পত্রিকার 'গান' নিবন্ধটি তার পরিচয়। হয়তো দিনেন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপ ঘটেছিল এটিতে।

মৃতা সপত্নীর প্রতি তার শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। প্রতিদিন তাঁর আলোকচিত্রে মাল্যার্ঘ্য রচনা ছিল তাঁর নিত্য কর্ম। স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ছিল তার তীক্ষ্ণ নজর। বেশবাশে পরিপাটী কমলা দেবী বৈধব্যের মোটা কাপড়ের সরলতায় নিজেকে রেখেছিলেন আবৃত। স্বামীর মৃত্যুর পর 'দিনেন্দ্র-রচনাবলী' প্রকাশ করে বিনম্র ভালবাসার অভিজ্ঞান রেখে গেছেন।

৬ ॥

১৯০৮-এ শান্তিনিকেতনে সেই যে এসেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, তারপর থেকে প্রায় আমৃত্যু এর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বিদ্যালয় শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ এবং সঙ্গীত শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ এই দুটি পরিচয়ই প্রাথমিক পর্যায়ে বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে দিনেন্দ্রনাথ ইংরেজি ও বাংলা— উভয় ভাষাই পড়াতেন। আদ্য-মধ্য বিভাগের এই পাঠচর্চা গতানুগতিক ছিল না বলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একটা গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দিনেন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে পড়াতেন শেলি ও কীট্‌স। তাঁর ছাত্র তেজেশচন্দ্র সেন লিখে গেছেন '৺দিনুবাবুর মুখে আমরা শুনতুম শেলি ও কীটস। যারা তাঁর মুখ থেকে কবিতা-পাঠ শুনেছেন, তারাই জানেন তিনি কী সুন্দর করেই না কবিতা পড়তেন।'

দিনেন্দ্রনাথের গভীরতম অনুরাগ ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। আবৃত্তি করতেন সহজ গভীরতায়। তাঁর কণ্ঠে আবৃত্তি যাঁরা শুনেছেন -পরবর্তীকালে সেকথা স্মরণ করে সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। অমিতা সেন (খুকু) লিখেছেন—'কি আশ্চর্য করেই না তিনি আবৃত্তি করতেন। তাঁর মুখে কবিতা শুনলে সেটি আর ব্যাখ্যা করে বুঝবার দরকার হত না।'

৭ ॥

দিনেন্দ্রনাথের খ্যাতির একটি উৎসস্থল, আগেই বলেছি, তাঁর সংগীতপ্রতিভা। সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা বিভিন্নমুখী। তিনি কখনো সংগীতশাস্ত্রবিদ, কখনো বা স্বয়ং গায়ক। কখনো

শিক্ষক, কখনো বা গীতিকার। কখনো বাদ্যযন্ত্রের নিপুণ শিল্পী, কখনো স্বরলিপিকার। তাঁর এই প্রতিভা তাঁকে এমনই প্রবাদস্থলে স্থাপন করেছে যে, অনেকেই ভুল করে ভাবেন তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথের গানে সুরসংযোজন করেছেন। বলা বাহুল্য এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। 'তাঁর কৃতিত্ব ছিল রচনায় নয়, প্রকাশে : উদ্ভাবনায় নয়, প্রচারে।'

ছোট থেকেই আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর মা সুশীলা দেবীর সুকণ্ঠই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। নানা ওস্তাদে পরিপূর্ণ ঠাকুরবাড়িতে এই সুরেলা কণ্ঠকে নিয়মনিষ্ঠ করার কোনো অসুবিধা ছিল না। ছোটবেলাতেই সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়বার সময়েই দিনেন্দ্রনাথ একবার পুরস্কৃত হয়েছিলেন পিয়ানো বাজানোয় দক্ষতা প্রদর্শনের কারণে। পৌত্রের এই সহজ সংগীতপ্রতিভার দিকে লক্ষ্য করেই তাঁর পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-কবিতায় লিখেছিলেন :

দিনু-দাদাজির কি ক'ব কাহিনী
বীণাপাণির সে যে শিষ্য !
উথলি উঠে যবে রাগ রাগিণী
পুথলি বনি যায় বিশ্ব ॥

শান্তিনিকেতনে এসে সেই বীণাপাণির আর এক বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরদিনের জন্য নাড়া বেঁধে নিলেন দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শিখে নিতেন কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই। রবীন্দ্রনাথ গাইতেন। শুনে শুনে তার আত্মীকরণ করতেন দিনেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া ক্ল্যাসিকাল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, দ্বিজেন্দ্র-গীতি, হিন্দীসংগীতের সব শাখাতেই তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। ছেলেবেলায় তিনি তো ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রিয়-শিষ্য বিশেষ। তাঁকে সংগে নিয়েই বহু গানের আসরে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কণ্ঠে নিজের গান শুনে মুগ্ধ হতেন। তবুও রবীন্দ্রসংগীতই তাঁর মনের সিংহভাগ অধিকার করেছিল।

> গায়ক দিনেন্দ্রনাথের কিছু পরিচয় ধরা আছে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত সাক্ষ্যগুলিতে। সাহানা দেবী তাঁর 'স্মৃতির খেয়া' বইয়ে একটি কৌতুককর তথ্য নিবেদন করেছেন : একবার খুব মজার একটা ব্যাপার হয়েছিল। দিনুদা কলকাতা এসেই টেলিফোনে ডেকে বললেন 'ঝুনু চলে এস, অনেক নতুন গান আছে।' আমি ত ছটফট করছি যাবার জন্যে, এদিকে মুস্কিল গাড়িও কিছুতেই জোগাড় করে ওঠা গেল না। ভবানীপুর থেকে জোড়াসাঁকো তো কম দূরের পথ নয়,—আমি আছি মামার বাড়ি রসা রোডে, আর ওঁরা জোড়াসাঁকোয়। গাড়ি নেই। তর সইছে না। তখন আমার মামার আপিস ঘরে দাঁড়িয়েই টেলিফোন যোগে চোদ্দটা গান শিখে নেওয়া গেল! দিনুদা জোড়াসাঁকো থেকে টেলিফোনে গাইছেন আর আমি ভবানীপুরে রসা রোডে টেলিফোন ধরে গান শিখছি—সে ভারি মজা।

দিনেন্দ্রনাথ প্রথমে গানের ক্লাস বসাতেন আশ্রমের ভিতরে নিজের বাসস্থানে, পরে শেষ

আস্তানা উত্তর খোয়াই এর ধারে 'সুরপুরী'তে। উৎসবে অনুষ্ঠানে আসতেন 'নন্দনে' বা স্কুলের কোনো বড়ো ঘরে। ছাত্র-ছাত্রীরা একটু বেসুরো হলেই এস্রাজের ছড় টানা বন্ধ করে দিতেন। ঠিক সুরে গান শেখার জন্যে, আর দিনেন্দ্রনাথকে দিয়ে গান গাইয়ে নেবার জন্যে তারা অবশ্য মাঝে মাঝে বেসুরো গান ধরত। অমনি তিনি 'থাম্ থাম্, ও কি হচ্ছে?' বলে চেঁচিয়ে উঠে গান ধরতেন।

যখন গান গাইতেন একেবারে ঝরণা যেত খুলে। রবীন্দ্রনাথের মতো দিনেন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু বর্ষা এলেই ছেলেরা প্রবল বেগে বিপুলদেহ দিনেন্দ্রনাথকে টেনে আনত বর্ষার অজস্র ধারার মধ্যে। মাঠে পড়েই দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ঝরত 'বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা ভাদরে'। ফাল্গুন পূর্ণিমাও একই উৎস দিত খুলে একেবারে। 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল' থেকে শুরু করে অজস্র গানে রাত্রি পূর্ণ করে "যখন গান থামলো, তখন পূর্ণিমার চাঁদ মাথার উপর থেকে পশ্চিমে অনেকটা হেলে পড়েছে।" পরিবেশের নিজস্বতা দিনেন্দ্রনাথকে এমনই অনিবার্য করে তুলত।

এই প্রসঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড সম্পর্কে কিছু তথ্য নিবেদন অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের ৬টি গান রেকর্ড করেন গ্রামাফোন কোম্পানি। গানগুলি হল—১. আমার পরাণ যাহা চায় ২. আমার মিলন লাগি তুমি ৩. আমার মাথা নত করে দাও ৪. মেঘের পরে মেঘ জমেছে ৫. আজি মর্মর ধ্বনি কেন এবং ৬. আলোকের এই ঝর্ণাধারায়।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর এই রেকর্ড সম্পর্কে আমাকে চমকপ্রদ তথ্য নিবেদন করেছেন। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' ও 'আলোকেব এই ঝর্ণধাবায়' গান দুটি তুলেও গ্রামাফোন কোম্পানি রেকর্ড প্রচার করলেন না—এটা একটা রহস্য। পরবর্তীকালে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এই গানটি প্রসঙ্গে এর স্বরলিপি নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়। গানটি প্রকাশ হলে এর মীমাংসা হতে পারত। এটি এখনও প্রকাশ করা উচিত রেকর্ড বের করে। দিনেন্দ্রনাথের নিজের গাওয়া গান সকল বাদানুবাদের উর্ধ্বে থাকা উচিত।

পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে দিনেন্দ্রনাথের গাওয়া সব গান 'পাস' করা হয়, কেবল এই গান দুটি ছাড়া। এ রহস্যও উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

৮ ॥

শুধু কণ্ঠসংগীতেই নয়, বাদ্যসংগীতেও দিনেন্দ্রনাথের ছিল বিশেষ অধিকার। পিয়ানোতে তাঁর হাতেখড়ি হয় খুব শৈশবেই। হারমোনিয়ামেও ছিল সহজ দক্ষতা। হারমোনিয়াম ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ উঠলে বিতর্ক উঠবে। শুধু দুটি কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উচ্চারণ করি। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতায় তিন দিন ব্যাপী যে উৎসব হয় দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর যুগ্ম পরিচালনায়—তাতে যথেষ্ট হারমোনিয়ামের ব্যবহার হয়েছিল এবং দিনেন্দ্র-শিষ্য রবীন্দ্রসংগীতের মহৎ কর্ণধার অনাদিকুমার দস্তিদারকেও হারমোনিয়ম বাজিয়ে বহুক্ষেত্রে গান গাইতে দেখা গেছে।

অবশ্য একথা আমাদের স্মরণে আছে যে, গান শেখানোর সময় দিনেন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো যন্ত্র ব্যবহার করতেন না।

হারমোনিয়াম ছাড়া অর্গানও তিনি বাজাতে শিখেছিলেন। শান্তিনিকেতনে সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর কাছে বীণ শেখার চেষ্টা করেছিলেন, খুব একটা আয়ত্ত করতে পারেন নি। প্রয়োজন মতো হার্মোনিয়ম অর্গান পিয়ানো বাজালেও এস্রাজ ছিল দিনেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র। সাহানা দেবী লিখেছেন :

> দিনুদার এস্রাজটি ছিল একটা বিরাট জিনিস। এই বিরাট এস্রাজটি দিনুদা বিরাট দেহের উপর টেনে নিয়ে কাঁধে যন্ত্রটিকে হেলিয়ে দিয়ে যখন বসতেন বাজাতে তখন তা দেখবার মত। দেখে কবি একদিন হেসে বলেছিলেন, 'দিনু, ওটা তোরই হাতে মানিয়েছে ভালো!' দিনুদা ও আমরা সবাই যা হেসেছিলাম। সত্যি এতবড় এস্রাজ আমি জন্মেও আর দেখিনি।

উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ একদা একটি এস্রাজ দিনেন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'কখনও যদি বিষণ্ণ হোস্, এটাকে বাজাস'। শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন একথা আমাকে জানিয়েছেন।

৯ ॥

দিনেন্দ্রনাথ কখনো রবীন্দ্রনাথের গানে সুর দেন নি—একথা আগেই জানিয়েছি। তাঁর কৃতিত্ব সুর সংরক্ষণে, স্বরলিপি নির্মাণে। স্বরলিপি তিনি লিখতেন পত্ররচনার সহজ সাবলীলতায়। কোনো যন্ত্র নয়, এমনকি গুণগুণ করে গাওয়াও নয়, 'সুর তাঁর মাথার মধ্যে খেলা করে বেড়াত, তিনি শুধু কাগজে কলমে তার প্রতিলিপি লিখে যেতেন অতি সহজে, অবলীলাক্রমে,—সেও যেন এক খেলা।'

এই খেলায় কবির সংশয়কে নিঃসংশয় করে দিতেন দিনেন্দ্রনাথ। কবির মাথায় এসেছে নতুন গানের ভাষা আর সুর—ছুটে গেছেন নীচু বাংলোর বাড়ির দিকে দিনেন্দ্রনাথের সন্ধানে। সবাই বুঝত কবির মনে গান আর সুর এসেছে ভিড় করে। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শক্তি, সুরসৃষ্টির পরক্ষণেই বিস্মৃত হতেন সেই সুর। তাই দিনেন্দ্রনাথ না থাকলে অজিতকুমার চক্রবর্তীরও মাঝে মাঝে শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু সকল ভরসা দিনেন্দ্রনাথের উপরই। শিলাইদহে নিয়ে যেতে চান তাই দিনেন্দ্রনাথকেই। মীরা দেবীকে লিখেছেন যে শিলাইদহে যেন তাঁর ঘরের পাশেই দিনেন্দ্রনাথের ঘর নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়।

কেমন করে স্বরলিপি নির্মাণ করতেন দিনেন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথ যখন গাইতেন, তিনি শুনে শুনে গাইতেন। এভাবেই পুরো গানটা তুলে নিতেন গলায়। বেশির ভাগ সময়েই পরের দিন স্বরলিপি করতেন। বলতেন 'কাল সকালে সব মনে পড়ে যাবে।' বাস্তবিকই তাই। হয়তো একদিনে দশটি গান লিখেছেন। পরের দিন ঐ দশটি গানেরই অকৃত্রিম স্বরলিপি রচিত হয়ে যেত কম্পিউটারের সূক্ষ্মতায়।

বাংলা গানের মতো ইংরেজি গানের notation-এও তিনি ছিলেন আদর্শস্থল। অনাদিকুমার দস্তিদারকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'দিনুর কাছ থেকে ইংরেজি সংগীতের staff

notationও শিখে নিয়ো। ঐ নোটেশানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সংগীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে ঐ নোটেশানের দরকাব হবে।'

দিনেন্দ্রনাথের আগে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, কাঙ্গালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী প্রমুখেরা। 'আনন্দসংগীত পত্রিকা'য় একসময়ে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র স্বরলিপি রচনা করেছিলেন প্রতিভা দেবী। পরবর্তীকালে করেছেন দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের একদা অনুমোদন পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশেই বাতিল হয়ে গিয়ে ভিন্ন স্বরলিপি নির্মাণের সুযোগ দিয়েছে। অথবা অন্যেরা ভিন্ন স্বরলিপি করতে চাইলে তিনি নিবৃত্ত করেন নি তাঁদের। ফলে সেই যে বদল শুরু হয়ে গেছে আজও তারই জের চলেছে। দিনেন্দ্রনাথ—যিনি সকল গানের ভাণ্ডারী—তাঁর পবিত্র ভাণ্ডারে পড়েছে অন্যজনের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। এ নিয়ে আক্ষেপ যত বাড়ে, হস্তক্ষেপও বাড়ে সেই পরিমাণে।

কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে নেই আমার। শুধু ধারাটিকে তুলে ধরতে চাইছি। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই এই বিরোধের সূচনা হয়েছিল। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।

> 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপি বদল করে হাল নিয়মানুগত করে লেখবার জন্য দিনুর হাতে দিয়েছি।…দিনু এখনকার ছেলেদের 'বিশ্ববীণারবে' যে ধাঁচায় গাইতে শিখিয়েচে সেই ধাঁচা অনুসারে স্বরলিপি লিখেচে। ঠিক মূলের অনুবর্তন করা দরকার মনে করে নি।… আমি ওকে বেকসুর খালাস দিতে ইচ্ছে করি। আমি জানি এ সম্বন্ধে তোর আইন অত্যন্ত কড়া…।

একদা 'মায়ার খেলা'র স্বরলিপিকর্ত্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী একে সহজে মেনে নেন নি। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এবং তাঁর চিঠির উত্তরে পুনশ্চ চিঠি লিখে (২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন:

> 'বিশ্ববীণারবে'র বিকৃতি সম্বন্ধে তোর আপত্তি সমর্থন করে তুই যে একটি অমোঘ যুক্তি সব শেষে নিক্ষেপ করেছিস সে একেবারে শক্তিশেলের মত এসে আমার মন্তব্যটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেচে।…দিনু যখন ভুল করে 'বিশ্ববীণারবে' শেখালে আমি বল্লুম বেশ হচ্চে, এই রকম হওয়াই উচিত। বুঝেচিস কেন? যদি বলি অন্যরকম হওয়া উচিত তাহলে হাঙ্গামা বাড়ে। তুই হয় ত রেগেমেগে শাপ দিয়ে বসবি, তোমার গান তাহলে সকলে যা ইচ্ছে তাই করে গাক!…মানুষকে ক্ষমা করতে গেলে মানুষকে বুঝতে হয়—সেইজন্যে এতক্ষণ ধরে তোকে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল—কিন্তু ক্ষমা করবি কিনা আমার সন্দেহ রয়ে গেল।

—প্রশ্রয়-পরিবর্তন-ক্ষমা সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথের সাজে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেজে দিনেন্দ্রনাথকে পরিবর্তন করা কি অন্যের সাজে?

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর সংগীতভবনের দায়িত্ব নেন দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর পরে অধ্যক্ষ হন ভীমরাও শাস্ত্রী (১৯২৩-২৭)। তাঁর পর পুনশ্চ অধ্যক্ষ হন দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শেষ অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। এ পর্যন্ত স্বরলিপিতে তেমন বিতর্ক সৃষ্টি হয় নি। পরে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণশশী দে প্রমুখেরা স্বরলিপি-পরিবর্তন বিষয়ে অভিযোগ এনেছেন, ভুক্তভোগীরা তা সবিশেষ জানেন।

দিনেন্দ্রনাথ স্বরলিপি করতে আরম্ভ করেন ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদানের কিছুকাল পর থেকেই। আমি যতদূর সন্ধান করে জেনেছি, তাতে তাঁর করা প্রথম স্বরলিপিটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সংখ্যায়। গানটি ছিল 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি'। পরে পরে 'আরো আরো প্রভু' 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' 'আজি শ্রাবণ ঘনগহন মোহে' 'জগতজুড়ে উদার সুরে' প্রভৃতি গানগুলির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্ববলিপি ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য ঐ গানগুলির স্বরলিপি দু'একমাস আগে পিছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি ১৩২১ বঙ্গাব্দের আগে প্রকাশিত হয় নি, অন্ততঃ স্বনামে।

রবীন্দ্রনাথের গান ক্রমশ প্রচারিত হওয়ায় এগুলির স্বরলিপিগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৩২৪ ১৩২৫ এবং ১৩২৭ বঙ্গাব্দে দিনেন্দ্রনাথকৃত প্রথম স্ববলিপিগ্রন্থ তিনভাগ 'গীতলেখা' প্রকাশিত হয়। এব আগেই অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বরলিপি গীতিমালা,' সরলা দেবীর 'শতগান' কাঙ্গালীচরণ সেনের 'ব্রহ্মসংগীত' ছয় খণ্ড, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'গীতলিপি'র ছয়খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে।

দিনেন্দ্রনাথের অন্যান্য স্বরলিপি-গ্রন্থগুলি হল: 'গীতপঞ্চাশিকা' (১৯১৮), 'বৈতালিক' (১৯১৮), 'গীতপত্র' (১৯১৮), 'কেতকী' (১৯১৯), 'শেফালি' (ঐ), 'গীতবীথিকা' (ঐ), 'কাব্যগীতি' (ঐ) দুইখণ্ড 'নবগীতিকা' (১৯১৯) 'বসন্ত' (১৯২৩)। 'গীতিমালিকা' দুইভাগ (১৯২৬, ১৯৩০), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৯২৮)। 'তপতী' (১৯২৯) এবং 'গীতলেখা' (১৯৩৫)।

সুদুষ্প্রাপ্য 'গীতপত্র' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে কৃত ৮টি জনপ্রিয় গানের স্বরলিপি। এই প্রসঙ্গে পৌষ ১৩৩২-এ প্রকাশিত দিনেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ২০০ গানের সংকলন (রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের গানের) উল্লেখযোগ্য।

কাজেই দেখা যাচ্ছে:

রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক
তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি,
যদি না দিতে সবারে।

—দিনেন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদ কতোখানি সত্য।

১০ ॥

দিনেন্দ্রনাথের আর এক পরিচয় তিনি 'নাটের কাণ্ডারী'-ও। ঠাকুর বাড়ির শিক্ষিত পরিবেশে অভিনয় ছিল নিত্যকৃত্য এক অনুষ্ঠানবিশেষ। দিনেন্দ্রনাথ এই পরিবেশে অভিনেতা এবং অভিনয়-শিক্ষক—দুই পরিচয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

দক্ষ সহনশীল পরিচালক দিনেন্দ্রনাথ পুরুষকে দিয়ে নারীর অভিনয়ের পরিবর্তে নারীকে দিয়ে পুরুষের ভূমিকা অভিনয় করানোর দুঃসাহস রাখতেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সমস্ত অভিনয়ের শিক্ষার ভার ছিল তাঁর উপরেই।

অভিনয়েও ছিল তাঁর সহজ পটুত্ব। অভিনয় করতে করতে গানও গাইতেন তিনি। অবশ্য একক কণ্ঠে কদাচিৎ। কোরাস গানেও তাঁর কণ্ঠই সবাইকে ছাপিয়ে উদাত্ত হয়ে উঠত।

বাল্মীকি প্রতিভা, শারদোৎসব, তপতী, বৈকুণ্ঠের খাতা, বিসর্জন, মায়ার খেলা, রাজা, ফাল্গুনী—রবীন্দ্রনাথের এসব নাটকে তিনি নানান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা'য় ঠাকুর্দা চরিত্রে দিনেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে সাহানা দেবী লিখেছেন :

> মনে আছে কালি ঝুলি মাখা কতগুলো কাপড়ের টুকরো পোশাকের সঙ্গে এখানে ওখানে ঝুলিয়ে দিনুদার গাইতে গাইতে প্রবেশ—
>
> 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই'—সে যে কী ভালোই লেগেছিল এমন নতুন ধরণের আর এমন অদ্ভূত মনে হচ্ছিল।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 'বিসর্জন'-এ রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথের অভিনয়ের কথা স্মরণ করে লিখেছেন :

> 'বিসর্জন' অভিনয়ে রঘুপতির ভূমিকায় তাঁর সেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর এখনো যেন কানে বাজছে। রক্তবসন পরিহিত রক্তলোলুপ পুরোহিতের দীর্ঘ শালপ্রাংশু আকৃতি, তাঁর ঘূর্ণ্যমান চক্ষুর ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে যে তীব্র তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা ক্ষণে ক্ষণে গর্জন করে উঠত, তার সুস্পষ্ট চিত্র চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকবে। তারপরে তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি আর একরূপে —অন্যকে অভিনয় শিক্ষা দিতে শিক্ষাগুরুর আসনে। সেখানে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, রসবোধের আভিজাত্য ও শিক্ষানৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়েছে।

১৯৩৩ সনের নভেম্বরে 'তাসের দেশ' নিয়ে বোম্বাই যাত্রা-ই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর গীত-অভিনয়ের শেষ সংযোগ।

একটি ইংরাজি নাটক পরিচালনাতেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সেকথা অনেকেই জানেন না। শেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এ পোর্শিয়ার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই মিসেস্ বিদ্যুৎপ্রভা দত্ত অল্পকাল আগেও আমাদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

১১ ॥

আসলে প্রাণপ্রাচুর্য ছিল দিনেন্দ্রনাথের জীবৎসত্তার মুখ্য উপকরণ। সাহিত্যে তাঁর অধিকারে তার প্রমাণ বর্তমান।

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বয়ং কবি। অথচ আত্মপ্রকাশে তাঁর কি আশ্চর্য কুণ্ঠা। তবুও একটি কবিতার বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন—'বীণ'। সুদুষ্প্রাপ্য এই সাতষট্টি পৃষ্ঠার কবিতাসংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ১৯১২ সালে। (কবির নামের বানান দীনেন্দ্রনাথ। এটিই ছিল তাঁব আসল নাম, পরে রবীন্দ্রনাথই 'দিন'+ইন্দ্র করেন—রবির আবির্ভাবে দিনের প্রকাশ এই ইঙ্গিত প্রকাশ করে)।

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী কমলা দেবী যে 'দিনেন্দ্ররচনাবলী' প্রকাশ করেন তাতে এই 'বীণ' অন্যান্য আরও কিছু গদ্য-পদ্য বচনাসহ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দিনেন্দ্ররচনাবলীও দুষ্প্রাপ্য।

বলা বাহুল্য দিনেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা ও গানে রবীন্দ্রনাথের শব্দ ও চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার আছে। এটা অস্বাভাবিক নয় নিশ্চয়ই। গানের সুরেও এই সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন রসিক-জনেরা। তবুও 'বর্ষশেষ' এবং 'নববর্ষ' কবিতাদ্বয়ে তাঁর ভাবের মৌলিকতা লক্ষণীয়।

'বীণ' দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। কারণ অভিমানবশে দিনেন্দ্রনাথ নিজের বাড়িতে জমা রাখা এবং শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির সমস্ত (রবীন্দ্রভবনে তাই একটিও 'কপি' নেই) কপি নিয়ে এসে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই অভিমান হয়েছিল 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এক বক্রোক্তির কারণে: 'দাদামশাই আর নাতি এত জোরে নীরব বীণা বাজাচ্ছেন যে দুদিন পরে গড়ের আর ব্যাণ্ড পার্টির দরকার হবে না।'

ব্যক্তিগত কিছু কবিতায় দিনেন্দ্রনাথের সরস মনটি ধরা পড়ে—যেমন প্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে লেখা:

ওহে প্রভাত
আমি হেথা আইঢাই করি একামূর্তি
আর তিন জন এলে হয় চতুষ্পূর্তি।
একা বসে খাই টানা পাখার বাতাস
কেউ নেই কাছে খেলি পাশা কিংবা তাস
দু'ঘণ্টা খেলিতে তব আছে কি আপত্তি
তাহলে কাগজ থেকে ছিঁড়ে এক রত্তি
লিখে দিও দু'কলম, হব নিশ্চিন্ত
বই পড়ে শুয়ে বসে কেটে যাবে দিন্ তো ?—দিনুদা

—পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথের স্টাইল মনে পড়ে যায় তাঁর এই প্রকীর্ণ কবিতাগুলি পড়লে।

১২ ॥

দিনেন্দ্রনাথের পয়লা নম্বরের পরিচিতি হওয়া উচিত পয়লা নম্বরের মজলিসি মানুষ হিসেবে। রবীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনের প্রথম আড্ডাধারী। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নিত্যানন্দ-বিনোদ গোস্বামীরা ছিলেন তাঁর 'আড্ডা-পক্ক' সঙ্গী। ধীরে ধীরে এর একটি শাখাও স্থাপিত হয়েছিল দিনেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। তাঁর 'বেণুকুঞ্জ', 'দেহলি' এবং 'সুরপুরী'তেও এই আড্ডা ছিল চলিষ্ণু।

এটি জমে উঠেছিল চা-য়ের এক আসরকে কেন্দ্র করে। ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণান্তে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন দোভাষী সু-সী-মোকে। এই বিদেশী বন্ধুর নামে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সু-সী-মো চা-চক্র'। গান লিখলেন :

হায় হায় হায় দিন চলি যায়
চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চলো চলো চলো হে।
টগবগ উচ্ছল কাথলিতল জল কল কল হে !···—ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের দিন খাওয়ানো হয় চীনে চা। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর নন্দলাল বসু কৃত রূপ-সজ্জায় চীনা মেয়ে সেজে চা পরিবেষণ করেন।

চা-বিলাসী দিনেন্দ্রনাথের বাড়িতে ধীরে ধীরে এই আড্ডা উঠে আসে। এক বিরাট তক্তপোশে মিলিত হতেন সবাই। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে আসতেন এই আড্ডায়। নন্দলাল বসু ছিলেন চক্রাধিপতি। কর্মকর্তা তেজেশচন্দ্র সেন। আসর জমিয়ে রাখতেন দিনেন্দ্রনাথ স্বয়ং।

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও এই চক্র 'দিনান্তিকা'র আড্ডায় মিলিত হত। বর্তমানে 'এখন সেখানকার বেণুবনটি যেমন লুপ্ত তেমনি বেণুকুঞ্জ শূন্য, চা-চক্র পরিত্যক্ত।'

১৩ ॥

তবে শিশুদের সঙ্গে তাঁর আড্ডাটি যত জমজমাটি হত, অতখানি বড়দের সঙ্গে হত না। দিন্‌-দাকে না হলে শিশুদের বুঝি একটুখানিও চলত না। দিন্‌-দার বিশাল বপু দূর থেকে দেখতে পেলেই তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হত। বৃষ্টিতে মাঠে দিন্‌-দাকে ভিজিয়ে গান গেয়ে তাদের সবার সেরা আনন্দ। 'আনন্দ বাজার' বসিয়ে দিন্‌-দার পকেট কাটতে তারা সদাতৎপর।

সর্বচারী তাঁর ভালবাসা মানুষ ও পশুপক্ষী—সর্বত্র গতিশীল ছিল। পুষেছিলেন একটি কুকুর, একটি হরিণও। 'পলাতকা' কবিতাটিতে যে 'কুকুর' আর 'হরিণ'-এর কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—তা এদের স্মরণ করেই।

১৪ ॥

দিনেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা করে দেখার অবকাশ নেই। ব্যক্তিগত পরিচয়ের নৈকট্যে এই সম্পর্ক ছিল 'ঘন দুগ্ধপুর'। ভ্রমণশীল এই খুল্ল-পিতামহের সঙ্গে তিনি কখনও গেছেন শিলঙে, কখনও রামগড়ে, কখনও বা কুমিল্লায়। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে গেছেন—সেখান থেকে আশ্চর্য কিছু পত্র

রচনা করেছেন এই প্রিয় নাতিটির উদ্দেশ্যে। 'রবীন্দ্রভবনে' এমন সতেরোটি পোষ্টকার্ড-পত্র আমরা সংরক্ষিত আছে দেখেছি।

দিনেন্দ্রনাথও প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে কবিতা-চিঠি লিখে আনন্দ দেবার চেষ্টা করতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল মধুর। নাতবৌ কমলা দেবীকে দ্বিজেন্দ্রনাথ একটু কালো সুতো আনতে বললে, তিনি যখন কালো সুতো পেলেন না, তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ সকৌতুকে বলেন—কালো সুতো যদি না পাও তবে তোমার কালো চুলের একটাই না হয় দাও ভাই। হেসে কমলা দেবী যেই চুল ছিঁড়ে দিচ্ছেন, এমন সময়ে দিনেন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন— কি সর্বনাশ! এ যে দেখছি একেবারে rape of the lock!

১৫ ॥

দিনেন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ-প্রকাশক, পত্রিকা-সম্পাদক বা সিনেমা কোম্পানির পরিচালক হয়েছিলেন—এ তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা।

পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'নানাচিন্তা' 'প্রবন্ধমালা' এবং 'কাব্যমালা' বই তিনটি শান্তিনিকেতন থেকে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। তিনটি বইয়েরই 'প্রকাশকের নিবেদন' লেখেন দিনেন্দ্রনাথ।

দিনেন্দ্রনাথ একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন স্বল্পকাল। পত্রিকাটির নাম 'মুক্তধারা'। দুষ্প্রাপ্য এই পত্রিকাটি ভগিনী নলিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে। যতদূর জানি, এই পত্রিকাটির তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মূল্যবান কাগজে ছাপা এই পত্রিকার প্রচ্ছদপত্র এবং হেডপিস এঁকেছিলেন স্বয়ং নন্দলাল বসু।

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা থেকে জেনেছি 'ওরিয়েন্টাল ফিল্মস্ লিমিটেড' নামক এক সিনেমা কোম্পানির তিনি আর্ট ডিরেক্টারের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কালীমোহন ঘোষ, সুরজিৎ লাহিড়ী, মিঃ এ. এন. ঠাকুর, মিঃ জে. সি. মৈত্র এবং সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী ছিলেন এর উপদেষ্টা পরিষদে। অবশ্য উদ্যোগ পর্বেই এই পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৬ ॥

শেষের কথায় অনিবার্যভাবে এসে পড়বে কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ। কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলেও বলা উচিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নাড়ির যোগে জড়িত কিছু মানুষ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান। বিধুশেখর শাস্ত্রী এই রকম একজন মানুষ। দিনেন্দ্রনাথ চলে যান শান্তিনিকেতন ছেড়ে ১৯৩৫ সালে। কেন গেলেন—এটাই ঐ অপ্রিয় প্রসঙ্গ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর উইলে শিলাইদহ ও পতিসরের জমিদারি তাঁর তিন পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারির অংশ নিরানব্বই

বছরের জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকায় ১৯১২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকে ইজারা দেন। পরে ১৯২৪ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন ডিড অফ সেটেলমেণ্ট করেন, তখন যেহেতু দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেই থাকতে পছন্দ করতেন সেইহেতু জোড়াসাঁকো বাড়ির আংশিক স্বত্বাধিকারের পরিবর্তে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়তি দেওয়া হল। এছাড়া মাসিক মাসোহাবা তো ছিলই। রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ এবং সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন এই টাকার বেনিফিসিয়ারি ট্রাস্টি। ১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের তৈরি বাড়ি (পরবর্তীকালে 'সুবপুরী' নামে পরিচিত) রবীন্দ্রনাথের কাছে বিক্রি করে দেন। পরে দশ হাজার টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঐ বাড়িটি এবং বাইশ বিঘা জমি কেনেন। বাকি যে টাকা রইল তা থেকে সুরেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনে পাঁচশো করে প্রতি বছরে দিনেন্দ্রনাথকে দেবেন—এই রকম ব্যবস্থা হয়। কিছুকাল পবে সুবেন্দ্রনাথ দেউলিয়া হয়ে পড়ায় কেবল রবীন্দ্রনাথই প্রতি বছব পাঁচশো টাকা করে দিতেন। এই নিয়মই দীর্ঘকাল চলছিল, ব্যতিক্রম ঘটল ১৯৩২-এর গ্রীষ্মকালে।

আসলে প্রায় প্রতি বছরেই স্থূলবপু দিনেন্দ্রনাথ ঐ টাকা নিয়ে দার্জিলিং ভ্রমণে যেতেন। কিন্তু ১৯৩২-এ তার প্রাপ্য টাকা প্রথম তিনি পেলেন না রথীন্দ্রনাথের বিরোধিতায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন—জমিদারি থেকে টাকা আদায় হচ্ছে না। শুনে দিনেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন—'রথীদের কোনো খরচের কমতি হচ্ছে না, আমায় দেবার বেলায় টাকা নেই ?'

দিনেন্দ্রনাথ যখন দেখলেন তাঁর রবিদাদা-ও এ ব্যাপারে কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না, তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগের সংকল্প মনে মনে গ্রহণ করলেন। ১৯৩৩-এ শান্তিনিকেতন দলের সঙ্গে ম্যাডান থিয়েটারে 'তাসের দেশ' অভিনয়ের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় এলেন। ঐ বছরের শেষের দিকে ওখানেই এলেন অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফাবেন্সে বাল্মীকি প্রতিভা আর মায়াব খেলার দায়িত্ব নিয়ে। শান্তিনিকেতনে বসবাসের অধ্যায় সমাপ্ত হল। আর একবাব মাত্র গেলেন সেখানে অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে। নিজের জিনিসপত্রের বিলি বন্দোবস্ত করে বাড়ি বন্ধ করে চলে এলেন চিরতরে।

কলকাতায় এসে ভাড়াব বিনিময়ে বাস কবতে লাগলেন 'বিচিত্রা'য়। এখানে থাকার সময় রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এক 'অপমানকর' প্রস্তাব এল—কিছু মাহিনার পবিবর্তে দিনেন্দ্রনাথ যদি শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রস্তাব নিয়ে এলেন নবাগত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। ক্ষুব্ধ দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন—'আপনি নতুন মানুষ তাই আপনাকে পাঠিয়েছে বলতে, ওদের কারো সাহস হয় নি এসে আমায় বলতে।'

রথীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব এবং রবি-দাদার ঔদাসীন্য তাঁর অপমানের ভবা পূর্ণ করে তুলল। অথচ কতোই না প্রত্যাশা ছিল—রবিদাদা অন্তত তাঁকে একবার ডেকে নেবেন।

১৭ ॥

মহাকালের আহ্বান এল। ১৯৩৫ সালের ২১এ জুলাই, ৫ শ্রাবণ ১৩৪২-এর শেষ রাতে ভিতরে জর্জরিত মানুষটি স্ট্রোক হয়ে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ চলে গেলেন।

এ সংবাদ এল শান্তিনিকেতনে। মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে সময়োচিত ভাষণে বললেন :

'অকস্মাৎ কাল দিনেন্দ্রনাথেব মৃত্যু সংবাদ আশ্রমে এসে পৌঁছল। শোকের ঘটনা উপলক্ষ্য করে আনুষ্ঠানিকভাবে যে শোকপ্রকাশ করা হয়, তার প্রথাগত অঙ্গ যেন একে না মনে করি।··· আশ্রমের তরফ থেকে দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যা বলবার আছে, তাই বলি।···এখনকার কর্মের মধ্যে যে একটি আনন্দের ভিত্তি আছে, ঋতু-পর্যায়ের নানা বর্ণগন্ধগীতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টায়, আনন্দের সেই আয়োজনে দিনেন্দ্র আমার প্রধান সহায় ছিলেন।···এই আশ্রমকে আনন্দনিকেতন করবার জন্য তরুলতাব শ্যামশোভা যেমন, তেমনি প্রয়োজন ছিল সঙ্গীতের উৎসবের। সেই আনন্দ উপচার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্র। এই আনন্দের ভাব যে ব্যাপ্ত হয়েছে, আশ্রমের মধ্যে সজীবভাবে প্রবেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, এর মূলেতে ছিলেন দিনেন্দ্র।···আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি, সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন, সেবাও করেছেন ; কিন্তু তার রূপ নেই বলে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ, এ তো যাবার নয়—যতদিন ছাত্রদের সঙ্গীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অধিগত করে থাকবেন ; আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়। এখানকার সমস্ত উৎসবের ভার দিনেন্দ্র নিয়েছিলেন, অক্লান্ত ছিল তাঁর উৎসাহ। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়নি—গান শিখতে অক্ষম হলেও তিনি ঔদার্য দেখিয়েছেন—এই ঔদার্য না থাকলে এখানকার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হত না। সেই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিদিন বৈতালিকে যে বসমাধুর্য আশ্রমবাসীর চিত্তকে পুণ্যধারায় অভিষিক্ত করে, সেই উৎসকে উৎসারিত করতে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। এই কথা স্মরণ করে তাঁকে সেই অর্ঘ্য দান করি, যে-অর্ঘ্য তাঁর প্রাপ্য।'

উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথ

প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী সকল নাটের কাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ, সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনিকগণের দিনুবাবু, বন্ধুগণের দিনুসাহেব, গানের প্রিয় ছাত্রদের দিনদা—শান্তিনিকেতনের প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আশ্রমটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন অনাগারিক, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন। একেবারে প্রথম আমলে যখন এখানে আসতেন, থাকতেন নীচু বাংলায় পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথের বাসস্থানে। তারপরে তাঁকে সাময়িক ভাবে থাকতে দেখেছি নূতন বাড়ির বড় হল ঘরটায়। আমার আবাস ছিল বীথিকা গৃহে, নূতন বাড়ি থেকে বিশ গজ দূরে। এখনো বেশ মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা যখন তিনি ফিরে আসতেন তখন তাঁর "নীলমণি" রামপ্রসাদ একখানা কাঠের চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে পা ধুইয়ে দিত। দিনুবাবু অবশ্য তাকে "নীলমণি" বলে ডাকতেন না। কিন্তু ঐ পা ধোয়াবার সুবাদে 'রামপ্রসাদ' 'আরামপ্রসাদ' বলে অভিহিত হলে কেউ বিস্মিত হত না। তারপরে তিনি উঠে এলেন দেহলী বাড়িতে, রইলেন দীর্ঘকাল। বস্তুত যে-দুটি বাড়ির সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত তার একটি দেহলী। এখানেই বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে ছুটে আসতে দেখা যেত ভুলে যাওয়ার আগে নতুন গানের কুঁড়িগুলি দিনুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে। তারপরে এল বিশেষভাবে তাঁর জন্যেই তৈরি "বেণুকুঞ্জ" নামে গৃহটি। 'বেণুকুঞ্জ' নামটি দ্ব্যর্থক। ঐ বাড়িটির কাছ বরাবর ছিল এক সার বাঁশ গাছ, দ্বিতীয় অর্থটা মনে করিয়ে দেয় সকল গানের ভাণ্ডারীকে। আর শান্তিনিকেতনের ভূমিতে তাঁর শেষ নিবাস সুরপুরী নামে বিখ্যাত। বাড়িটি তৈরি করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারপরে ঘুরে ফিরে এল সকল গানের ভাণ্ডারীর হাতে, এটিই তাঁর শান্তিনিকেতনের শেষ গৃহ।

এইসব গৃহে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় তাঁদের কাছে তিনি দিনুবাবু কিম্বা দিনু। তবে তাঁকে দিনুসাহেব বলত কারা? আশ্রম বাসকালের একেবারে প্রথম আমলের বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন দিনুসাহেব। কিন্তু একজন ছাড়া তাঁদের স্মৃতি আমার কাছে কালের পক্ষাঘাতে ঝাপ্‌সা। যাঁর স্মৃতি ঝাপ্‌সা হয়নি তিনি প্রথম আমলের লোক হলেও পরিণত বয়সে শিক্ষক হয়ে আবার ফিরে এলেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য চন্দননগরের উপকণ্ঠস্থ খলিসানির বাসিন্দা। চন্দননগরের ছাত্রদের কাছে তিনি মাস্টারমশায়। শুধু তাই নয়, সেকালের চন্দননগর আর মাস্টারমশায়দের অনেক গুণ তাঁর ছিল। ছাত্রদের তিনি বিপ্লবের কানমন্ত্র দিতেন। অর্থাৎ সরাসরি বিপ্লবের শিক্ষাগুরু না হয়েও ছিলেন বিপ্লবের প্রাইভেট টিউটর। সেকালের শান্তিনিকেতনের পুরাতন পরিচয় আবার নূতন ভাবে ঝালাই হল। নরেনবাবুর মুখেই প্রথম শুনলাম দিনুসাহেব শব্দটা। দুই পুরাতন বন্ধু বিকালবেলায় সুরপুরীর দোতলায় বসে ঘোলের সরবৎ পান করতে করতে পুরানো সেই দিনের কথাকে মনের মধ্যে ওলট-পালট করতেন।

আর তাঁকে দিনূদা নামে অভিহিত হতে শুনেছি তাঁর গানের প্রিয় ছাত্র অনাদি দস্তিদারের মুখে। অনাদি আমার বাল্যবন্ধু। সে যে দিনুবাবুকে দিনূদা বলবে এটা এমন বিস্ময়ের নয়—গানের ছাত্ররা অনেকেই বলত দিনূদা। অনাদির দিনূদা উল্লেখে কিছু বিশেষ ছিল। তখন অনাদি দুরারোগ্য রোগের কবলমুক্ত হয়ে উঠেছে বৎসরকালব্যাপী ভোগেব পবে। তখন সে প্রাণটা ফিরে পেয়েছে পায়নি একালের স্ফূর্তি, মনের মধ্যে জড়িয়ে আছে চৈতন্যেব আলো আঁধারি ভাব, সেই আলো আঁধারির মধ্যে একটি শিখা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারীর'— অনাদির সঙ্গীত শিক্ষাগুরুর মধুর স্মৃতি। তাই সে বাড়িব লোকজনাব উদ্দেশ্যে বলত "তাড়াতাড়ি ভাত দাও দিনূদা বসে আছেন।" কিম্বা বলত 'দেরী হলে দিনূদা রাগ করবেন'। এইসব দুজনেরই স্মৃতি ছড়িয়ে ছিল, গুরুর ও শিষ্যের। অনাদির এইসব উক্তি লোকমুখে যখন আমার কানে আসত সে কী রকম গুরু, সে কী রকম ছাত্র, মৃত্যুর গুহার মধ্যে যার হাত প্রবেশ কবেছে। এতে পাওয়া যায় ছাত্রদেব উপরে দিনুবাবুব প্রভাব। দিনুবাবুর গানের ভাণ্ডারে আমার প্রবেশের অধিকার ছিল না তবে যেখানে তিনি ছিলেন সকল নাটের কাণ্ডারী সেখানে কিছু কিঞ্চিৎ প্রবেশ ছিল, অনেকেই বলত অনধিকারে। তবে সেকথা এখন থাক্ যথাসময়ে আসবে। তবে এখনো মনে তাঁর একটা স্মৃতি ছিল। তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন কীট্‌সের কাব্য। Endymion আর Ode বা স্তবগাথাগুলো। Endymion কীট্‌সের শ্রেষ্ঠ কাব্যেব মধ্যে নয় কিন্তু দিনুবাবুর পড়াবার জাদুতে Endymion-এব সুন্দর বনে আমি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম আর এখনো তা আমার কাছে শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে আছে। আর দুটি Ode এর মধ্যে Grecian urn এবং নাইটিংগেল পাখির উপরে লিখিত কবিতা আজ ষাট বছর পরেও মনেব উপরে তাদের জাদু বিস্তার করে। বিশেষভাবে নাইটিংগেল পাখির উপরে লিখিত কবিতাটি পঠিত দেশি-বিদেশী যাবতীয় কবিতার মধ্যে আজও শীর্ষস্থান অধিকাব করে আছে। ঐ কবিতাটির স্বর্ণ কুঞ্চিকায় আমার কাছে খুলে দিয়েছিল কবিতার স্বর্ণভাণ্ডার। এখনো আজ ষাট বছব পবেও কারণে অকারণে ঐ কবিতাটির ছত্র বিশেষ মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। সে কি কেবল কীট্‌সের প্রতিভায়! কীট্‌সের প্রতিভার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল দিনুবাবুর কণ্ঠের জাদু। একথা সত্য যে তাঁর গানের ভাণ্ডারে আমি প্রবেশ করতে পারিনি, তবে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ভিতরের রহস্যের কিছু স্বাদ গন্ধ পেয়েছি। আমার মতো অ-সুরের পক্ষে যদি দিনুবাবুব কণ্ঠের এমন জাদু হয় তবে অনাদির মতো সুরলোকের অধিবাসীর পক্ষে চৈতন্যের আলো আঁধারিতে দিনুবাবু যে দিনূদা রূপে প্রতিভাত হবেন তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

সমস্ত ভ্রাতুষ্পৌত্রদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়। শেষ বয়সে একবার রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ গিয়ে আসানটুলি নামে একটি বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। ঘটনাচক্রে আমি তখন দার্জিলিং-এ ছিলাম, যাতায়াত ছিল আমার রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেখানে গিয়ে তাঁর মনে পড়ল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি জিনিস সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছেন, সেটি আর কিছুই না—দিনেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁকে লিখে পাঠালেন "রবিদাদা কহে কৈসে গোঙায়বি দিনু বিনে দিন রাতিয়া।" অবিলম্বে ফলোদয় স্বরূপ দিনেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কখনো তাঁকে হাতছাড়া করতেন

না। জোড়াসাঁকোয়, শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহে, রামগড়ের পর্বত শিখরে, যেখানে রবি সেখানে দিন। বস্তুত তাঁদের তিন পুরুষ শান্তিনিকেতনের অধিবাসী ছিলেন। নীচু বাংলায় রাজর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের আদি অট্টালিকায় দ্বিপেন্দ্রনাথ,—যাঁকে এণ্ডরুজ সাহেব বলতেন মহারাজ আর শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন গৃহে উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথ, যাঁকে নিয়ে আমাদের এই পরিচ্ছেদ। রবীন্দ্রনাথ তথা এই সব ব্যক্তির সেবক হওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের সেবক তিনজন রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সেবক মুনীশ্বর স্থান পেয়েছে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে। দিনেন্দ্রনাথের তেমন সেবক-সৌভাগ্য ছিল না। একজনের নাম ছিল রামপ্রসাদ, অপরজনের নাম কেদার, নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামের অধিবাসী। লোকটি ছিল ভাঁড়ুদত্তের পাল্টা সংস্করণ। বাহারে এবং ব্যবহারে দুই রকমেই। তাকে সন্দেশ আনতে দিলে সেগুলো আকারে ছোট হয়ে যেত। জিজ্ঞাসিত হলে বলত, মা কি আর বলব চিনির যা দাম।

দিনুবাবুর স্ত্রী বলতেন তা বটে, কিন্তু ক্রমেই যে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—চিনির দাম যে ক্রমেই বাড়ছে মা।

—তবে সন্দেশ থাক, কাল থেকে রসগোল্লা আনবে।—বেশ মা তাই হবে।

তখন সে টেকনিক বদলাল। রসগোল্লাগুলো তুলে নিয়ে চুষে রস আকর্ষণ করত, তারপরে আবার রসের মধ্যে ছেড়ে দিলেই সরস হয়ে যেত। এইভাবে কিছুদিন চল্‌ল কিন্তু সংসারে অজেয় কে ? রসগোল্লা তখনও অখণ্ড মণ্ডলাকারং থাকত কিন্তু একদিন বোধকরি রসে চাপ বেশি দিয়েছিল। ভিজে গিয়েছিল তার কাঁধের গামছাখানা। বেচারীর চাকরীটা গেল।

এখানে সংক্ষেপে দিনুবাবুর পিতা ও পিতামহের বর্ণনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। সৌজন্য গুণটা মজ্জাগত ব্যাপার। দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শনাভিলাষী কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে গেলে তিনি বলতেন 'বসুন আপনারা'। তারা উপবিষ্ট হলে বলতেন 'আপনাদের স্নানাহার হয়েছে তো' ? রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে প্রথমেই তিনি বলতেন 'বসুন'। বা ব্যক্তিভেদে 'বোস্'। তাঁর ঘরে কয়েকটি বাড়্‌তি মোড়া থাকত, তারই একটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করতেন। আমার মতো খুচরো ও নিত্য ব্যক্তির প্রতিও এই নির্দেশ ছিল। একটি মোড়া অধিকার করে বসলে তবে পরে অন্যকথা। আর কোনোরকমে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে না পেরে (চেষ্টা করেছি কিন্তু কাজটা সহজ নয়) কয়েকটি মোড়া সংগ্রহ করেছি। খুচরো বা পাইকারি কোনো ব্যক্তি দেখা করতে এলে আগে বলি 'বসুন'। বা 'বোসো'। এই হিসাবে আমি অবশ্য রবীন্দ্রানুসারী বা রবীন্দ্রানুকারী। আর দ্বিপেন্দ্রনাথের বর্ণনায় কিছু বেশি স্থান আবশ্যক। তবে তা গ্রন্থান্তরে সেরে নিয়েছি। এখানে বাকি অংশ বলা যেতে পারে। তিনি বাড়িটার উত্তর দিকের বারান্দায় সকাল বেলাতেই দরবার জমিয়ে বসতেন। দরবারিরও অভাব হত না। কারণ রাতের গাড়িতে কলকাতা থেকে নিত্য আসত নানারকম উপাদেয় ভোজ্য। সে খবর কে না রাখত। তাঁর রাজকীয় বেশভূষা চেহারা ও উদারতা দেখে এণ্ডরুজ তাঁকে মহারাজা বলে ডাকতেন।

কিছুদিন এণ্ডরুজ বাড়িটার দোতালায় থাকতেন, সারাদিন বসে বসে তিনি দেশ দেশান্তরে লিখতেন চিঠিপত্র। বারে বারে তাঁকে যেতে হত নিকটস্থ ডাকঘরে। তাঁর এই অভ্যাস লক্ষ্য করে দ্বিপুবাবু বলতেন তুমি কেন বারে বারে ডাকঘরে যাও। ডাকঘরে আমার হিসাবে কিছু টাকা জমা দেওয়া আছে, তোমার চিঠিপত্র পাঠিয়ে দিলেই চলবে, তোমাকে কষ্ট করে ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে হবে না। মাসান্তে ডাক-বাবু করজোড়ে দ্বিপুবাবুর কাছে নিবেদন করলে আপনার হিসাবে আর কিছু টাকা জমা দিলে ভালো হয়।—কেন, কত ছিল ?—আজ্ঞে, ষাট টাকা।

এক মাসে এণ্ডরুজের ডাক খরচ ষাট টাকা শুনে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত হল, কিন্তু সঙ্কুচিত হল না তাঁর রাজকীয় উদারতা। এমন ব্যক্তির প্রতি মহারাজা সম্বোধনকে ভাষার অপব্যবহার বলা চলে না।

আর উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথের বিবরণ এত সংক্ষেপে দেওয়া চলে না, কারণ এঁদের সকলের চেয়ে বেশিদিন আশ্রমে বাস করেছেন তিনি। শুধু তাই কি, কালক্রমে আশ্রমের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সকল গানের ভাণ্ডারী সকল নাটের কাণ্ডারী বলেছেন, বাড়িয়ে বলেন নি। তিনি নাটক শিখিয়েছেন, গান শিখিয়েছেন, মাত্র কি এই! ছেলেদের ইংরাজী বাংলা ক্লাস নিয়েছেন, ছাত্রদের খেলার মাঠে ফুটবলের প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে তিনি, ছেলেরা বনভোজনে চলল তিনি চললেন সঙ্গে, ছাত্রদের ভ্রমণের তিনি সঙ্গী, কেঁদুলির মেলায়, নান্নুরের মেলায় সঙ্গে আছেন দিনুবাবু। আশ্রমের অঙ্গীভূত হওয়া আর কাকে বলে। আর সমস্তই বিনা পয়সায়।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার উপরেও দিনেন্দ্রনাথের প্রভাব অসীম। শারদোৎসব থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত নাটক দিনেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না। এইসব নাটকের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে এদের গীতিবহুলতা, এদের গানের দলের বালক এবং ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর নামধারী গীতিপরিচালক সমস্তই দিনুবাবুর লক্ষণাক্রান্ত। তিনি এঁদের নাটকে একাধারে সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল নাটের কাণ্ডারী আর সেই বালকদলের ঠাকুর্দা বা দাদাঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের শুরু থেকেই নাট্যধারা বর্তমান কিন্তু তাতে পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি নাই; এইসব লক্ষণের সূত্রপাত শারদোৎসব নাটক থেকে আর তা চলে এসেছে শেষ পর্যন্ত, মাঝখানে ব্যতিক্রম ডাকঘর প্রভৃতি দু-তিন খানা নাটক। এর কারণ কি? প্রথম ও প্রধান কারণ দিনেন্দ্রনাথ ও আশ্রমের বালকগণ কিন্তু তারপরে যখন আশ্রমে বালিকাদের ভর্তি করা শুরু হল তখন সম্ভব হল নটীর পূজা, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নাটক রচনা। দিনেন্দ্রনাথ তথা আশ্রমের গঠন রবীন্দ্রনাট্যধারার একটি উৎসারক। তাই দিনেন্দ্রনাথ তথা আশ্রমের বালক-বালিকাগণকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাট্যধারার বিবর্তন কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাঁর নাট্যধারার মধ্যে আশ্রমের অধ্যাপকগণের স্বভাবতই স্থান ছিল কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের প্রভেদ এই যে তাঁরা ছিলেন উৎসবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু দিনুবাবু ছিলেন স্বয়ং উৎসবরাজ। এখন এই উৎসবের মধ্যে এবং উৎসবরাজের সঙ্গে আমি কি করে ভিড়ে পড়লাম সেই কথা বলব।

ছেলেবেলায় দোলের সময়ে আমাদের বাড়িতে পালা হত আবার উপলক্ষ্য বিশেষে বাড়ির

বারোয়ারীতলাতেও যাত্রা গান হত কিন্তু আমরা সে-সব দেখি কর্তাদের তা অভিপ্রেত ছিল না। তাই আমাদের দেখাটা অনেকটা ডুব দিয়ে জল খাওয়ার মতো লুকোচুরি ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিধির দুর্জ্ঞেয় বিধানে এমন এক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হলাম, যেখানে নাটক দেখা দূরে থাক নাটকে যোগ দেওয়াটাই বিধান ছিল। এমনকি নাটকের রিহার্সাল দেখবার জন্যে ক্লাস বন্ধ থাকত। রবীন্দ্রনাথের মতে এটাও শিক্ষার অঙ্গ।

যতদূর মনে পড়ে শারদোৎসব নাটকে লক্ষেশ্বরের বালক পুত্র রূপে আর অচলায়তনে সুভদ্র-রূপে রঙ্গমঞ্চে আমার প্রথম অবতরণ, কে আমাকে নির্বাচন করল, কোন গুণ দেখে নির্বাচন হল, সে কথা মনে পড়ে না ও দুটো ভূমিকাই নিতান্ত minor ব্যাপার ছিল। কিন্তু তার আগে মুকুট নাটকে ঈশা খাঁর ভূমিকা নিয়েছিলাম। সেটা নিতান্ত minor ব্যাপার ছিল না। অনেকের মতে, বিশেষ আমার ইংরাজী পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করে যিনি হতাশ হয়েছিলেন সেই নেপালবাবুর মতে তেমন ঈশা খাঁ নাকি আর হয়নি। এমন কি মূল ঈশা খাঁ কিছু শিখতে পারত আমার ভূমিকা দেখে। দিনুবাবু হাতে কলমে এসব কিছুই শেখান নি আমাদের, তাঁর অভিনয় দেখে আমরা কতক গুণ আত্মস্থ করে নিয়েছিলাম।

ঘুরে ফিরে দু'খানা নাটক বারে বারে অভিনীত হত। অচলায়তন আর বিসর্জনের নারী বিবর্জিত সংস্করণ। এ দু'খানা করবার একটা সুবিধা ছিল এই যে মেয়েদের ভূমিকা এসব নাটকে ছিল না। তারপরে এল কৈশোরের মেঘদূতরূপে ফাল্গুনী নাটকখানা। একবার বিসর্জন নাটক করবার দিন স্থির হয়ে গিয়েছে। এসব দিনক্ষণ ধার্য করবার ভার ছিল প্রজিতের ওপর, প্রজিত তখন বয়স্কের দলে। এদিকে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের অনেকে গিয়েছে জোড়াসাঁকোতে কি একটা অভিনয় হবে। তাদের ইচ্ছা আশ্রমে এসে বিসর্জন নাটকটা দেখে। কিন্তু প্রজিতের বিধান অমোঘ। কিছুতেই দিন বদল হবে না বলে সে ঘোষণা করেছে—এমন সময় হঠাৎ সে ঘোষণা করল নাটকটির অভিনয় হবে পরবর্তী দিন। সকলেই বিস্মিত, আমিও। গিয়ে ধরলাম প্রজিতকে, কি হে ব্যাপার কি? সে আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছোট একখানা কাগজের টুকরো দেখাল। তাতে দুটি ছত্র লিখিত আছে "এখানে ছেলে মেয়েরা বিসর্জন নাটক দেখতে চায়, দিন বদলে দেবেন। অতসী।" প্রজিত বলল, আর কাউকে বলোনা, তুমি অনেক কথাই জানো তাই তোমাকে বললাম। আমি বললাম, মা ভৈঃ এরপরে আর কথা নেই। দিন বদল হল। আর একবার বিসর্জন নাটকে ভূমিকার বদল হল। রঘুপতির ভূমিকা আমার বাঁধা ছিল। সেবারে আমাকে সাজতে হল জয়সিংহ, আর রঘুপতি দিনুবাবু। অভিনয়ের পরে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, দিনু যখন তোর বুকের উপরে পড়ে গেল, ভাবলাম তোর মরতে যদি কিছু বাকি থাকে তবে দিনুর চাপেই তা সুসম্পন্ন হবে। কিন্তু সবচেয়ে জমে ছিল বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে। আমি তিনকড়ি, দিনুবাবু বৈকুণ্ঠ। সেবার দেখেছিলাম দিনুবাবুর অভিনয়ের উৎকর্ষ। হাসিতে অশ্রুতে এমন মেশামেশি, মনে হয় যেন দিনুবাবুকে সম্মুখে রেখেই ভূমিকাটি রচিত। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লিখিত গীতিবহুল নাটকে আমার প্রবেশা-

ধিকার ছিল না। কারণ আমার সুরের কণ্ঠ ছিল না। সুরের কণ্ঠ তথা বাজনার হাত কোনোটিই ছিল না। একবার ভীমরাও পণ্ডিতজীর কাছে বাজনার পরীক্ষা দিতে গেলাম। তবলায় একবার চাঁটি মারতেই তিনি বলে উঠলেন, তুই গিয়ে ক্যানেস্তারার টিন বাজা গিয়ে। এ সব তোর চলবে না। শান্তিনিকেতনের দল মাঝে মাঝে অভিনয় করতে কলকাতায় যেত আমি তাদের সঙ্গে কখনো যাইনি। না, একবার গিয়েছিলাম তবে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভূমিকার বদলে প্রম্পটারের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। ব্যাপারটা এই রকম। শারদোৎসবের নামান্তর ঋণশোধ, সন্ধ্যাবেলায় অভিনয় হবে, আলফ্রেড থিয়েটারে। টিকিট বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে খবর এল শান্তিনিকেতনে দ্বিপুবাবু মারা গিয়েছেন। দিনুবাবু রওনা হয়ে গেলেন। গুরুদেব তো ভেবেই অস্থির এখন উপায়। অবনীবাবু বললেন, "কোনো চিন্তা নেই দেখই না কি করি। আমি নেব দিনুর ভূমিকা।"—"তুমি নেবে দিনুর ভূমিকা? একটা কথাও তোমার মুখস্থ নেই।" "মুখস্থ করবার কোনো প্রয়োজন হবে না আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে প্রম্পটার—" এই বলে আমাকে আর বিভূতি গুপ্তকে কালো কাপড়ের ঘোমটার মতো মাথায় দিয়ে সাজিয়ে নিলেন, আমাদের হাতে দিলেন দু'খানা music board এর stand এর মতো লাঠি আর তার আড়ালে থাকল দু'খানা ঋণশোধ নাটক। তখন আমরা নির্ভয়ে প্রম্পট্ করতে লাগলাম। অভিনেতারা আর আমাদের কাছছাড়া করেন না। দর্শকরা আসল রহস্য বুঝতে না পেরে ভাবল ও দুটো হয়তো কোনো কিছুর সিম্বল হবে। ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণিত আছে অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া বইখানাতে।

অচলায়তন অভিনীত হচ্ছে—দিনুবাবু পঞ্চক; পঞ্চক বালক কিন্তু বিশালবপু দিনুবাবুকে কিছুতেই বালক বলে চালানো অসম্ভব। তখন কে একজন বুদ্ধি দিল পঞ্চকের গায়ের আলখাল্লাটায় লম্বা করে অনেকগুলো কুঁচি দেওয়া হোক তা হলে দর্শকের চোখ সেই দিকে পড়ে দেহের বিপুলতা প্রচ্ছন্ন করে দেবে। তাই করা হল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কুঁচিগুলো বড় ঘন ঘন দেওয়া হয়েছিল তার ফলে আলখাল্লা এত কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে সেটা পরে যখন তিনি মঞ্চস্থ হলেন মনে হল যেন একটি বিশালকায় তাকিয়া, কিন্তু:শেষ পর্যন্ত তাকিয়াটা কারো চোখে পড়ল না পঞ্চকের কাছে তাকিয়ার হার হল। তাঁর বিশাল দেহে বিপুল শক্তি ছিল। ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটির পরে আমরা যখন ফিরে আসতাম গৌর প্রাঙ্গণে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বাহু ধরে শূন্যে তুলে আম্রভোজন-জনিত ওজনটা অনুমান করতেন। নাঃ খুব মুটিয়েছে—বলে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিতেন।

তারপরে যখন আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সমাপ্ত হলে বাড়ি ফিরবার সময় হত তখন সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিতেন, এটা একটা বাঁধা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর আর একটা স্মৃতি চিরকাল মনে থাকবে, সেই স্মৃতিটা তাঁর মহত্ত্বের নিশানারূপে আজও মনে উড্ডীন আছে। একদিন বিকালবেলায় কি একটা কাজে তাঁর সুরপুরী বাড়িতে গিয়েছি। আমি তাঁকে দেখবার আগেই আমি তাঁর চোখে পড়লাম। তিনি বারান্দায় বসে কানা উঁচু একখানা ডিশে মুড়ি খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখবামাত্র তিনি বলে উঠলেন, কমল, এই যে বিশী এসেছে, ওর জন্যে মুড়ি পাঠিয়ে দাও। মুড়ির

মত অতি সামান্য ভোজ্যকে তিনি অতিথির দিকে এগিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। তখন বুঝতে পারলাম প্রকৃত আভিজাত্য ভোজ্যের অসামান্যতার উপরে নির্ভর করে না, করে আমন্ত্রকের উদারতার উপর। দু'জনে গল্প করতে করতে মুড়ির বাটি শূন্য করে ফেললাম— অবশ্য মুড়ির সঙ্গে 'টুড়ি' ছিল।

অবশেষে বৎসরান্তে যথাকালে হোলির সময় এসে পড়ল। শান্তিনিকেতনে আবিরখেলা কোনো সময়েই নিষিদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে উপস্থিত থাকলে তিনিও আবির গ্রহণ ও আবির দান করতেন। কিন্তু যে-বারের কথা বলছি সেবার তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সেবার উপস্থিত ছিলেন একজন কট্টর ব্রাহ্ম। তাঁর ধারণা ছিল শান্তিনিকেতন একটা ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠান। তিনি প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে হিন্দু আর ব্রাহ্ম নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করতেন।

আবির খেলাটাকে তিনি বিশেষভাবে হিন্দুদের ব্যাপার বলে মনে করতেন। এবারে রবীন্দ্র-নাথের অনুপস্থিতি তাঁকে জোর দিল। ক'দিন আগে থেকে তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন আশ্রমে আবির খেলা অসঙ্গত। ওটা ব্রাহ্ম সমাজের অনুমোদিত নয়। বাকি সকলে অর্থাৎ শতকরা পঁচানব্বই জন বললেন এখানে প্রতি বৎসর আবির খেলা হয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাতে যোগ দেন। স্পষ্টত কিছু না বললেও ভাবে-ভঙ্গীতে তিনি প্রকাশ করলেন যে রবীন্দ্রনাথও যেন যথেষ্ট ব্রাহ্ম নন। (একসময়ে বহুতর ব্রাহ্মের ঐরূপ ধারণা ছিল) অথচ অধিকাংশ লোক আবির খেলার পক্ষে। তখন তিনি ক্ষিতি-মোহনবাবুকে উকিল পাকড়াও করলেন। বললেন 'আপনি তো পণ্ডিত লোক, আবির খেলা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কি মত প্রকাশ করে বলুন।' উকীল নির্বাচন করতে গেলে একটু সতর্ক হওয়া দরকার একথা তিনি জানতেন না। ক্ষিতিমোহনবাবু বললেন, 'বিলক্ষণ! ব্রাহ্মধর্ম পুস্তিকায় আছে আবিরা-বির্ম এধি'। কট্টর শুধালেন, 'অর্থাৎ?' 'অর্থাৎ সরল, আবিবে আবিরময় হও।' ব্রাহ্মধর্মের বিপক্ষে রায় যাওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি হতাশ হয়ে সেই দিনেই শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করলেন। তিনি স্টেশনের দিকে রওনা হলেন। এদিকে দেহলী বাড়ির কাছে (তখন দিনুবাবু থাকতেন) উৎসবরাজকে ঘিরে অসিত হালদার (নাতি) নগেন গাঙ্গুলি (জামাতা) আর আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণ খোল করতাল সহযোগে আবির ছড়াতে ছড়াতে শালবীথিকার পথে আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। সকলের মধ্যস্থলে দিনেন্দ্রনাথ, সকলের উপরে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ, আর চারদিকে আবিরে আবিরময় হয়ে রঙীন কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টি করল—আর সেই সঙ্গে গান (হায় সেটাও আবার রবীন্দ্রনাথের রচিত)—

যা ছিল কালো-ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ তার সনে আর ভেদ না র'ল॥
রাঙা হল বসন-ভূষণ, রাঙা হল শয়ন-স্বপন—
মন হল কেমন দেখ্‌ রে, যেমন রাঙা-কমল টলোমলো॥

দিনেন্দ্র-স্মৃতি বাসরে

জসীম উদ্‌দীন

মঞ্চে দাঁড়ায়ে বক্তৃতা কবি দুখিনী বঙ্গ মায়
উদ্ধার তুমি করিতে পারোনি মামুলি কথার ঘায়।
সরস্বতীর কমল বনেতে করি মহা কোলাহল,
ভৃঙ্গদলেরে স্তম্ভিত কবি নাড়নি দীঘির জল।
চল নাই তুমি রাজপথে কভু বাজাইয়া ঢোল ঢাক,
দৈনিকে তব সংবাদ পড়ি চক্ষে লাগেনি তাক।
দেশ জুড়ে তাই তোমার স্মৃতির হয় নাই সম্মান,
তোমার মরণে হিসাব হয়নি স্বদেশের লোকসান।
কারণ তুমি ত চাহনি জীবনে সস্তা যশের হার
সভাসমিতির হাততালি আর অভিনন্দন ভার।

ওসব যাহারা ভারে ভারে পায়, তুমি জেনেছিলে তারা
মণির ছলেতে কাঁচের বেসাতি বহিয়া হইছে সারা।
নিজেরে তাহারা সস্তা করিয়া সস্তার মাল কেনে
ফাঁকা কথা দিয়ে ফাঁকা কথা পায় হাওইবাজীর বেণে।
সভা করে তারা দেশ-সেবা করে দেশ তাই সভা ডাকি
দুই যুগ হতে দিয়েই চলেছে এ-অভাগাদের ফাঁকি।

এসব তোমার জানা ছিল তাই মূর্খ বেণের দলে
তোমার বাণীর চিমনির দ্বার খোল নাই কুতুহলে।
অথবা এ সব কিছু
জানিতে না তুমি জীবনের পথে চাহনি ফিরিয়া পিছু ;
ঊর্ধ্ব আকাশে বিহার করিতে সুরের ইন্দ্ররথে
তব আনন্দ নীহারিকা হয়ে জড়াইত পথে পথে।

রামধনুকের সপ্ততারেতে বাজাতে মেঘের গান
পাখায় পাখায় দোলা দিয়ে তারে তুলিত তোমার প্রাণ
তুমি জানিতে না মাটির ধরারে আকাশে চলিতে বলে
অঙ্গে মাখনি এ মাটিরে তুমি কাদা করে পদতলে।

এ মাটির খেলাঘর
তোমার নিকটে খেলাঘরই ছিল সারাটি জনমভর।
মাটির দেশের সম্মান খ্যাতি, খেলা ঘরে অভিনয়
এর কোন মোহে তাই ত তোমার ঘটে নাই পরাজয়।

আজিকে নূতন করে
ডাকিব না তাই সুরের দুলাল এই অভিনয় ঘরে
জীবন ভরিয়া তুমি যা রচেছ শুনো বাতাসের পরে—
কোন্ সে মায়াবী সুরেরে ছেড়েছ সযতনে ধরে ধরে।
সেই সুর-জাল তখনি মিলেছে অনন্ত নীলিমায়,
শিশির ফোঁটারে ধরা যায়, তারে ধরা ছোঁওয়া নাহি যায়
এমনি ক্ষণিক সৃষ্টিরে লয়ে ছিল তব কারবার,
মাটির ধরায় স্মৃতি রাখিবারে কিবা প্রয়োজন তার।
যেই পথে তব সুর চলে গেছে সে সুর নদীর জলে,
জীবনেরে তুমি কুসুমের মত ভাসায়েছ কুতূহলে।
আজিকে তোমার মরণ-বাসরে মিলিয়াছি ভাই বোন
অন্তরীক্ষ হইতে হয়ত শুনিতেছ ক্রন্দন।
আমরা তোমার দেশবাসী নয়—আত্মীয় পরিজন
আমরা তোমার অতি আপনার মনে কথা কওয়া মন।
তোমার আছিল আকাশের মত সীমারেখাহীন ঘর
তার চেয়ে ছিল অনেক উচ্চ প্রসারিত অন্তর।
সেখানে ছিল না আপন পরের বেড়াঘেরা ব্যবধান
যে এসেছে কাছে তাহারই বুকেতে ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ।
বিধাতা তোমারে সন্তানবর না দিয়ে একটু ছলে
তোমার ঘরেতে টেনে এনেছিল সব সন্তান দলে

তাইত তোমার শ্রাদ্ধ বাসরে কোরাণের সুর গাহি
খোদাতাল্লার আরস ধরিয়া বেহেস্ত তব চাহি।
তোমার চিতায় লুবানের ধুয়া আজি আমি ছড়াইব
'সবে বরাতে'র রজনী জাগিয়া মোমবাতী জ্বালাইব।
মোর মসজিদে এক কোণে বসি নামাজের শ্লোক পড়ি
বিনিদ্র বাতে কাঁদিব কখনো তোমারে স্মরণ করি।
আজিকে তোমার স্মৃতির বাসরে মিলিয়াছি বোন ভাই
আমবা তোমার দেশবাসী নয়—গুণগ্রাহী আসি নাই।
তোমার সারাটি জীবন ভরিয়া গড়েছ যে সংসার
আমরা তাহারই বিয়োগ ব্যথিত ছিন্ন বীণার তার।

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত পারিবারিক স্মরণ সভায় কবি জসীমউদ্দীন এই কবিতাটি পাঠ করেন। ইতিপূর্বে এই কবিতা কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষণ পদ্ধতি

পঙ্কজকুমার মল্লিক

রবীন্দ্রনাথের গানে তথা আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের জগতে দিনুবাবুর প্রভাব ও দান, আমার মতে তাঁকে আক্ষরিকভাবে দিনেন্দ্রনাথ বা সূর্যদেবের মতই মর্যাদা দিয়েছে। আক্ষেপ হয় যখন দেখি তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা হল না। আমরা কণ্ঠশিল্পী মাত্র। সে কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যারা সঙ্গীত বিষয়ে তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক অনুসন্ধানী এবং লেখনী চালনায় পটু তাঁরা কেউ এই অসামান্য সঙ্গীতজ্ঞকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও আলোচনা আজ পর্যন্ত কেন করেন নি জানি না।

...মনে পড়ে, একদিন আমি ভরসায় বুক বেঁধে একাই চলে গিয়েছিলাম দিনেন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, কোন পরিচয়পত্র নেই, নিজস্ব কোন গুণগরিমাও নেই। সম্বল খানিকটা দুঃসাহস মাত্র।

...পথ চিনে যখন দিনেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলাম, তখন শ্যামবর্ণ স্থূলাঙ্গ মানুষটিকে চিনতে পারিনি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে যখন তাঁর কাছে আপন পরিচয় নিবেদন করলাম এবং আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম তখন তাঁর বাক্‌ভঙ্গি থেকে বুঝলাম যে আমি এক প্রবল ব্যক্তিত্বের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি। শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমি আম্‌তা আম্‌তা করছি। উনি একটি আরাম কেদারায় বসেছিলেন, বললেন—হ্যাঁ, আমিই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কী চাই তোমার।

আমি বললাম—আজ্ঞে আমি একটু আধটু গান গাইতে পারি, রবিবাবুর গান শেখার বড় ইচ্ছে আমার। শুনেছি আপনার কাছেই শিখতে হয়, তাই এসেছি।

—বটে গান জানো? কী গান জানো?

—আজ্ঞে, এই নানা ধরণের গান, যাত্রা, পালা, থিয়েটরের গান—

—থিয়েটার! তুমি থিয়েটার দেখো?

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ তখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের থিয়েটার দেখা গুরুজনদের চোখে দুষ্কর্ম বলে নিন্দিত হত।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে সম্প্রতি 'সীতা' দেখেছি মা, পিসিমা, জ্যাঠাইমা প্রভৃতির সঙ্গে।

দিনেন্দ্রনাথ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন—আচ্ছা, তুমি বোসো।

তারপর একটু থেমে বললেন—ভালো করে বসে একটা গান শোনাও দিকি।

নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় এবং বিনা হারমোনিয়মে গান ধরলাম 'মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে'।

বিশেষ করে এই গানটি গাওয়ার পিছনে আমার একটু চাতুরি ছিল। 'সীতা' নাটকের প্রধান পরিচালক ছিলেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ, সুতরাং এ গানে তাঁরই দেওয়া সুর। নিজের গান শুনে তিনি নিশ্চয়ই খুসী হবেন, আমাকে বিমুখ করতে পারবেন না।

দিনেন্দ্রনাথ চুপ্ করে শুনলেন আমার গান। শেষ হলে বললেন—গানটি তো দিব্যি তুলে নিয়েছ! আচ্ছা তোমাকে রবিদার একটা গান শিখিয়ে দিচ্ছি। চুপ্ করে বোস।

তারপর গীতাঞ্জলি খুলে আমায় একটি গান পড়তে দিলেন—ধ্রুপদাঙ্গের সেই বিখ্যাত সঙ্গীত—'হেরি অহরহ, তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে'।

বললেন—দেখো রবি ঠাকুরের গান যদি শিখতে চাও তো মনে রেখো আগে গানের বাণী ও ভাবটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। বার বার পাঠ করে বাণীবাহিত ভাবটুকুকে কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করাতে হবে। তারপর সুরের শিক্ষা। বুঝলে? ভাব না বুঝে লাইন ধরে ধরে সুর নকল করলে আর যাই হোক রবি ঠাকুরের গান শিখতে পারবে না। দেখি গানটা বেশ ভালো করে পড় তো শুনি। বেশ ধীরে ধীরে অর্থ বুঝে বুঝে পড়বে। তারপর পড়া শেষ হলে যখন সুর তুলবে, দেখবে ভাবের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিলন,—যেন যুগলসম্মিলন পুরুষ ও প্রকৃতি, রাধা ও কৃষ্ণ। দুই-এর মিলনেই পূর্ণতা! যাক, এত কথা এখন বুঝবে না, এখন পড় তো।

ভাষাটা অবিকল এই না হলেও এমনি কথাই তিনি বলেছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথের আদেশে আমি পড়তে লাগলাম

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে।

পড়ি আর দিনুবাবু মাঝে মাঝে বাধা দেন—ঠিক হচ্ছে না, হল না। এই রকম বলে নিজে খানিকটা খানিকটা আবৃত্তি করে যান। তারপর থেমে গিয়ে বলেন এইবার ঠিক করে পড়। আবার মাঝখান থেকে পড়তে সুরু করি আমি। ঠিক মত যতি দিয়ে নির্ভুল ভঙ্গিতে পড়ে ভাবকে আত্মস্থ করা এবং ভাবকে আত্মস্থ করতে করতে আরও নির্ভুলভাবে পড়তে পারা—কবিতা বা গীতিকবিতাকে ধরে এইভাবে এগোতে হয় একথা এই প্রথম জানলাম। আমার কবিতা ও কাব্যসঙ্গীত পাঠের হাতেখড়ি বা সূচনা হল।

এই সুগম্ভীর গীতটির সমগ্র ভাবটিকে আয়ত্তের মধ্যে আনা আমার সেই বয়সের পক্ষে কখনোই সম্ভবপর ছিল না। তথাপি গানের ভাবলোকের দেহলি প্রান্তে অন্তত দাঁড়াতে পেরেছিলাম দিনুবাবুর শিক্ষার গুণে। তাঁর এই শিক্ষাদান পদ্ধতি সেকালে বিরল ছিল। এভাবে কেউ করাতেন না, আর বোধহয় কেউ ভাবতেনও না।

অনেকে আমায় প্রশ্ন করেছেন—আমি আকাশবাণীতে আমার 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর'-এ গান শেখাবার আগে, অতবার পড়ি কেন। বানান করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ভেঙেচুরে, অর্থনির্দেশ করে কেন অতবার পড়ি ও পড়াই ?—বস্তুত এটা হচ্ছে দিনেন্দ্রনাথের কাছে আমার ওই শিক্ষার ফল। তাছাড়া আমি মনে করি বাংলা কাব্যসঙ্গীত শিক্ষাদানের এর চাইতে ভালো পদ্ধতি আর কিছু নেই, হতে পারে না। তাই সারা জীবন ধরে দিনুবাবুর নির্দেশই মেনে নিয়েছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত বা বাংলাসঙ্গীতের জগতে দিনুবাবুর চাইতে বড় শিক্ষক আর কেউ হননি বলেই আমার বিশ্বাস।

যাইহোক সেদিন তো রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারীর কাছে অপটু কণ্ঠে পড়তে লাগলাম—

সারা নিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায় তোমারি বিবহ রাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায় তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেমে হায় কত বাসনায় কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া, কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া,
তোমারি বিরহ উঠেছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে॥

বহু চেষ্টার পর আমার পড়া তো তাঁর কাছে কোনমতে গ্রহণযোগ্য হল। এর পরে সুরের ব্যাপার। গানের ভাণ্ডারী এবার সুরের কাণ্ডারী হয়ে একটু একটু করে গেয়ে আমায় সুর তোলাতে লাগলেন।

সেদিন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবিবাবুর গান শেখার সূচনা হল আমার—এই ভেবে হৃদয়মন নৃত্যপর হয়ে উঠেছিল। সেদিন চলে এলাম কিন্তু আবার কয়েকদিন পরে গিয়ে হাজির হলাম। কালক্রমে একটি একটি করে অনেক গান তাঁর কাছে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু গান তোলা বললেই সবটা বলা হয় না। তাঁর কাছে আসা-যাওয়া মানেই ছিল একটা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করে আসা—কাব্যে, সঙ্গীতে, রসগ্রহণ পদ্ধতিতে। গান ও সুর ছিল সহজাতভাবে তাঁর শিরায় শিরায়, আর সেই সঙ্গে ছিল কঠোর নিয়মানুবর্তী শিক্ষকের দাপট। রবীন্দ্রনাথ যোগ্য ব্যক্তিকেই তাঁর গানের ভাণ্ডারী ও সুরের কাণ্ডারী নিয়োগ করেছিলেন।

'আমার যুগ আমার গান' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

কাছের মানুষ দিনদা

১ ॥

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের দিনদা, তাঁকে আজ আমরা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে সমবেত হয়েছি, তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে। টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট আমাদের সে সুযোগ করে দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ।

দিনদার কাছে আমরা সবাই অশেষ ঋণে ঋণী—সেই তাঁদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতেও তা প্রবহমান থাকবে, সন্দেহ নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের গান চিরকালের সম্পদ। চিরকালই তাঁর গান সবারই সুখ দুঃখের সাথী হয়েই থাকবে। আর সে গান যে হারিয়ে যায় নি, তার মূলে আছেন দিনেন্দ্রনাথ। তিনি স্বরলিপি করে গানগুলি ধরে না রাখলে গান তো হারিয়েই যেত।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন "তার চেষ্টা না থাকলে আমবা গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেননা নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণেব শক্তি অসাধারণ, আমাব সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে নিজের সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল।"

আমরা, যারা দিনদার কাছে গান শিখেছি, তাঁর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আমরা অনুভব করতে পারতাম যে গুরুদেবের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তি ভালবাসা ও নিষ্ঠা ছিল। আর ছিল গুরুদেবের গান, তাঁর প্রাণের সম্পদ। সেই ভাবেই তিনি গুরুদেবের গানকে আগলে রেখেছিলেন যাতে তার মধ্যে ভেজাল না ঢোকে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রচার করে গেছেন, গান শিখিয়ে গেছেন অক্লান্ত ভাবে। দিনদার সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা কেবলই কিংবদন্তী হয়েই থাকবে কিনা, ভবিষ্যৎই বিচার করবে। তবে একটা ক্ষোভ মনে থেকে যায় যে দিনদা তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন। নবীনরা কতটুকুই বা তাঁর সম্বন্ধে জানেন।

অথচ রবীন্দ্রসঙ্গীত যে বিপুল সমাদর লাভ করেছে, তার গোড়াপত্তন তো দিনদারই। পরে যাঁরা স্বরলিপি করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বুনিয়াদ আরও শক্ত করেছেন, তাঁদের কাছেও দেশবাসী অবশ্যই কৃতজ্ঞ, কিন্তু মূলে যে আছেন "সকল গানের ভাণ্ডারী" দিনেন্দ্রনাথ, সে কথাটাই সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন ও তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়াও কর্তব্য। গুরুদেব স্বয়ং তাঁকে শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যখন "ফাল্গুনী" উৎসর্গ করে বলেছিলেন "আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে এই

নাট্য কাব্যটি কবি-বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম”—এ যে কত বড় সম্মান ও স্বীকৃতি ও কী গভীর স্নেহের উক্তি তা মনে করে আজও অভিভূত হতে হয়। আর তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী' তো কবিবাউলের কাছে নিজেকেই সমর্পণ করে দিয়েছিলেন, কিছু বাকি রাখেননি, কিছু ফিরে চাননি।

দিনেন্দ্রনাথ নিজে যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সেদিকে তিনি দৃষ্টি দেননি শুধু নয়, নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশ্চর্য রকম অনীহা ছিল। তিনি বড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, কবি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন যে কাব্যরসে তাঁর মত দরদী অল্পই দেখা গেছে; অপূর্ব অভিনয়দক্ষতাও ছিল তাঁর। তাঁর সাহিত্যচর্চার যেটুকু সামান্য পরিচয় রেখে গেছেন—ফেলে গেছেন বলাই সঙ্গত—কারণ তাঁর নিজের কবিতার বই, যার নাম দিয়েছিলেন 'বীণ,' তার প্রায় সবকটিই তিনি নিজেই পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। যে দু একখানা পাওয়া গিয়েছে, তাতেই প্রমাণ হয় সাহিত্যজগতে তিনি একজন বিশিষ্ট যশস্বী রূপেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন। কিন্তু সে দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেননি, মেতে ছিলেন তাঁর রবিদার গান নিয়ে। তাঁর 'সৃষ্টিকে নিয়েই নিজের সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ' করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে দিনুদা ছিলেন সবারই একান্ত প্রিয়জন। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। যে অনাবিল আনন্দ, তিনি দান করতেন তাঁর গানে, অভিনয়ে, গল্পে, সহৃদয় ব্যবহারে, এমনটি তো সবাই দিতে পারেন না। ছাত্রছাত্রীদের গভীর স্নেহে কাছে টেনে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর।

প্রথমে যখন, দিনুদার কাছে উপস্থিত হলাম তখন কিন্তু ঠিক এই মনোভাব হয়নি, বরং তাঁর বিশাল বপু, ঈষৎ রক্তিমাভ বড় বড় চোখ, গম্ভীর মুখ দেখে ভয়ই পেয়েছিলাম। চকিতে মনে এসেছিল এঁরই কাছে গান শিখতে হলে কি হবে!

অবশ্য অচিরেই সে মনোভাব কোথায় মিলিয়ে গেল। তাঁর স্নেহ মমতায় ভরা, সহজ সুন্দর ব্যবহারে কাছের মানুষ হয়ে উঠতে দেরি হল না। আর তাঁর গান শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম কী অপূর্ব কণ্ঠস্বর! এমন জলদগম্ভীর অথচ মাধুর্যে ভরা কণ্ঠস্বর তো দৈবে শোনা যায়! তিনি যখন গান গাইতেন, গান যেন মূর্ত হয়ে উঠত। এঁরই কাছে গান শিখতে পাব ভেবে তখন কী আনন্দ!

কয়েক দিনের মধ্যেই দিনুদা ঢালা নির্দেশ দিলেন যে, কলেজের ক্লাসের ফাঁকে এসে রোজ যেন গান শিখে যাই। তাছাড়া ছিল ক্লাস অনুযায়ী গান শেখা।

তাঁর কাছে শিক্ষার দিনগুলি আমার দুর্লভ সম্পদ হয়ে রইল।

দিনুদা যেখানেই থাকুন, যা-ই করুন একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। তাই আমাদের ক্লাস কখনও নীরস হয়ে ওঠেনি। অবশ্য গান শেখাবার সময় কোনো শৈথিল্য হতে দিতেন না, কিন্তু ক্লাস হয়ে যাবার পর অনেক সরস গল্প করতেন, আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উপভোগ করতাম। আমরাও নিঃসঙ্কোচে কত যে কথা বলে যেতাম, যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি। ছোট বড় নির্বিশেষে তিনি সত্যিই সবারই বন্ধু ছিলেন।

আবার তাঁর যদি কাউকে খ্যাপাবার ইচ্ছে হত, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। যে যেদিন

'টারগেট' হত, তাব অবস্থা কাহিল হয়ে উঠত। তাঁব কৌতুকপ্রিয়তার অনেক গল্প শুনতাম, আর নিজেদেব অভিজ্ঞতাও কম জমে ওঠেনি।

উৎসব উপলক্ষে গুরুদেব নিত্য নতুন গান বচনা কবতেন আব দিনুদা শিখে নিতেন। তারপব দিনুদা সবাইকে শেখাতেন। এই ক্লাস হত পুবনো নন্দনেব বড় ঘরে। প্রথমে আশ্রমবাসী সবারই জন্য থাকত অবাবিত দ্বার,- যাতে সবাই নতুন গান শিখতে পারেন। আব সে ঘর ভবে গিয়ে উপচেও পড়ত। পবে ছাত্র ছাত্রীদেব মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে গানেব দল তৈবি করে নিতেন। তখন গুরুদেবেব উপস্থিতিতে উত্তবায়ণে নাচ গানেব বিহার্সাল হত।

একবাব সেই বকম বড় বিহার্সালেব মধ্যেই দিনুদাব খ্যাপাবাব মন জেগে উঠল। তখন গান শেখাচ্ছিলেন 'আমাব গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে'। গান কবতে কবতে তিনি একটি মেয়েব দিকে, কেবলই কৌতুকভবা আড় চোখে চাইছেন আব মৃদু হাসিতে মুখ ভবে যাচ্ছে। যে সেদিনেব 'টারগেট' সে তো ঠিকই বুঝতে পেবেছে, আব মনে মনে চিড়বিড়িয়ে উঠছে অথচ প্রকাশ করাব উপায় নেই। আসলে সে ছিল মনে মনে বাগদত্তা, আব তা দিনুদাব অগোচবে থাকতেই পাবে না। গান সমানে হয়ে চলল, মেয়েটিও গান গেয়ে চলল যাতে কেউ না বোঝে। বিহার্সাল হয়ে যাবাব পব যখন দলেব বেশিব ভাগ চলে গেল, দিনুদা বললেন "জানিস তো, এই গান শুনে একজন মহা খুশি। সে ভাবছে গুরুদেব তারই জন্য গানটি লিখেছেন।" তখন সে আব চুপ কবে থাকতে পারলনা—বাগ কবে অনুযোগ করতে শুরু কবে দিল—আর দিনুদাব কী হাসি !

দিনুদার পুবনো দিনের একটা গল্প আমবা খুব উপভোগ কবতাম। তাঁব সে কৌতুকপ্রিয়তা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে তিনি নিজেই জব্দ হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় শান্তিনিকেতনে একজন গুজরাতী সুপণ্ডিত ভাষাবিদ এসেছিলেন। তিনি ফবাসী শেখাতেন এবং নিজেও বাংলা শিখতেন।

তাঁব ফবাসী ক্লাসে তাঁব অধ্যাপকবাও এসে বসতেন, যেমন বিধুশেখব শাস্ত্রীমশাই, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ। একদিন শাস্ত্রীমশাই একটা শক্ত প্রশ্নেব সঠিক উত্তব দিলে, অধ্যাপকমশাই বলে উঠলেন "বাঃ, শাস্ত্রীমশাই আপনি তো একটা আস্ত ঘুঘু!" এই পর্যন্ত শুনেই তো আমবা আঁৎকে উঠেছিলাম—শাস্ত্রী মশাইয়েব কী মনোভাব হয়েছিল তাই ভেবে। শাস্ত্রীমশাই তা ভালই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দৃঢ় কঠিন স্ববে প্রশ্ন কবে যে কে শিখিয়েছে এমন কথা। সে ভদ্রলোক তো ততক্ষণে আঁচ করে ফেলেছেন যে কিছু একটা মাবাত্মক ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। ভয়ে ভয়ে বললেন—দিনুদা শিখিয়ে বলেছিলেন যে এর অর্থ অসাধারণ বুদ্ধিমান! শাস্ত্রীমশাই পবে যে দিনুদাকে ছেড়ে কথা কননি তাও আমবা শুনেছিলাম আব দিনুদাও যে জব্দ হয়েছিলেন সেটাই বিশেষ কবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

দিনুদা যখন ঘর ভর্তি ক্লাসে গান শেখাতেন, তাঁর কান পড়ে থাকত কোন দিক থেকে বেসুর বা ভুল সুব হচ্ছে। ঠিক ধরেও ফেলতেন। তখন গান থামিয়ে ছোট ছোট দল করে গান করাতেন। বারে বারে গাইয়ে নিয়ে সুর নির্ভুল হলে তবেই ছাড়তেন। খোলা গলায় পরিষ্কার

উচ্চারণ করে গান না করে কারুর নিস্তার ছিল না। বড় বড় চোখ আরও বড় করে ধমক দিয়ে বলতেন "হাঁ কর, মুখ বুজে বুজে গলা চেপে গাইবি না।"

তখন কার সাধ্য ছিল গলা না ছেড়ে গাইবে! বলতেন "জানিস, বিলেতে গান শেখাবার আগে, মুখ হাঁ করবে কতখানি, জিভ কখন কি ভাবে নাড়বে, স্বরক্ষেপন কি ভাবে হবে, এইসব দীর্ঘদিন শিখিয়ে তার পর গান শেখানো হয়।—আর তোরা!" বলে নকল করে দেখাতেন কি করে গলা চেপে গাওয়া হয়। তখন হাসির উচ্চরোল উঠত ঠিকই, কিন্তু যা শিক্ষনীয় তা শেখাও হত। আর চোখের সামনে বই খুলে গান গাওয়া তো নৈব নৈব চ! গুরুদেবও খোলা গলায় গান গাওয়া পছন্দ করতেন। বস্তুত তখনকার দিনে সেটাই রীতি ছিল, মাইকের কথা তো কেউ ভাবতেন না।

খুকুর (অমিতা সেন) কথা খুব মনে হয়। ক্লাস শেষ করে বোর্ডিং-এ ফেরার পথে মাঝে মাঝেই সে প্রাণভরে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে আসত। মনে হত সারা আশ্রমেই তার গান ভেসে বেড়াচ্ছে। খুকু দিনূদার একান্ত প্রিয় শিষ্যা ছিল। ছোট্ট বেলা থেকেই সে শান্তিনিকেতনে এসেছিল। তখন থেকেই সে দিনূদার অতি প্রিয় কন্যাসম হয়ে উঠেছিল। সে গুরুদেবেরও প্রভূত স্নেহের পাত্রী ছিল। তার অকালবিয়োগে রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। শুধু গাইবার জন্য নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ঠিক ভাবে ধরে রাখবার জন্যও।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুরের মিলন যে অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছে, তা দিনূদার কাছে গান শিখতে শিখতে আপনা হতেই মনে গেঁথে গিয়েছিল। তাঁব শিক্ষাব এমনই ধরণ ছিল যে, মন ভাবের গভীরে চলে যেত। কেবল ব্যাকরণের মত করে তো শেখাতেন না।

দিনূদার ওপর আমাদের এমন অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল যে গুরুদেব নিজে যদি কখনও কোনো গান একটু অন্য রকম সুরে গাইতেন, আমরা তা মেনে নিতে চাইতাম না। একবার উৎসব উপলক্ষে গুরুদেবের সামনে রিহার্সাল দেবার জন্য উত্তরায়ণে গিয়ে আমরা দেখলাম দিনূদা তখনও আসেন নি। গুরুদেব বললেন "তোরা গান শুরু করে দে। দিনু এসে পড়বে'খন।" বলে নিজে গাইতে শুরু করলেন, আমরাও গাইতে লাগলাম। খানিকটা গাইবার পর গুরুদেব একটু অন্য রকম সুর ধরলেন। আমরা তো চুপ! তিনি গান থামিয়ে বললেন, "কি হল রে, চুপ করে গেলি কেন।" আমরা ভারি অস্বস্তিতে পড়লাম। খুকু আমতা আমতা করে বলল, "গুরুদেব আপনি যে অন্য সুর করছেন!" তিনি কপট রোষে বলে উঠলেন "ও তোমাদের দিনূদাই ঠিক সুর করেন আর আমার সুরই ভুল—কেমন? আরে, আমার পাঁঠা আমি ল্যাজায় কাটি কি মুড়োয় কাটি, তাতে তোদের কিরে?" আমরা তো খুব হাসতে লাগলাম কিন্তু গান আর শুরু হল না। এমন সময় দিনূদা এসে পড়ে সর্বরক্ষে হল। গানও পুরোদমে শুরু হয়ে গেল।

আসলে আমরা তো জানতাম যে গুরুদেব নিজের গানের সুর নিজেই ভুলে যেতেন। দেখেওছি তাঁর সেবক বনমালী দিনূদাকে বাড়িতে না পেলে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত, "বাবা মশাই দিনূদাকে ডাক দিয়েছেন, গান শিখতে হবে।" তাই দিনূদাই ভরসাস্থল হয়ে গিয়েছিলেন। দিনূদার

গান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সৈয়দদা (সৈয়দ মুজতবা আলি) বড় সুন্দর করে তাঁর উপলব্ধির কথা বলে গেছেন। বলেছেন, "স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা, দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত, সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গম্ভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়-মন ভরে দিত, তারপর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ভাঙা খোয়াই পেরিয়ে কোথা থেকে কোথা চলে যেতো। তাই আমার সব সময় মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-নাথের কণ্ঠ একজনকে শোনাবাব জন্য, এমনকি একটা সম্পূর্ণ আসরকে শোনাবার জন্যও নয়, তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে শোনাবার জন্য।"

যাঁরাই দিনুদাব গান শুনেছেন, তাঁবাই সৈয়দদার সঙ্গে একমত হবেন সন্দেহ নেই।

শিশুবিভাগের ছেলে মেয়েরাও তাঁর গান-পাগল ছিল। দিনুদাকে কাছে পেলে তারা ছাড়তে চাইত না। তিনিও গান গেয়ে, গান শিখিয়ে, আবৃত্তি করে, গল্প বলে, আসর জম্‌জমাট করে তুলতেন। তাঁর ছিল তাদের সঙ্গে প্রাণের টান। তারাও উজাড় কবে দিয়েছিল তাদের ভালবাসা। তাদের যত আবদার সব দিনুদাকেই সামলাতে হত। বৃষ্টিতে ভিজতে বেরলেও দিনুদা সঙ্গী হতেন, চড়ুইভাতি হলেও তাই, আর তাঁর বাড়িতে গিয়ে খাওয়া তো যেন তাদের প্রাপ্যই ছিল।

তিনি যখন দুপুরবেলা রিহার্সাল নিতে আসতেন, তখন শিশুবিভাগেব সামনে দিয়ে মোটর চালিয়ে আসতেন। অমনি ছেলেরা ছুটে বেরিয়ে আসত, গাড়ির ভিতরে, বাইরে, বনেটের ওপরে কোথাও আর জায়গা থাকত না। দিনুদা তখন শম্বুক-গতিতে গাড়ি চালাতেন। কিছুদূরে এসে তাদের নামিয়ে দিতেন। তারাও দ্বিরুক্তি না করে স্বস্থানে চলে যেত। তিনি যতই কেননা সহজ ভাবে তাদের সঙ্গে মিশতেন তারা আপনা হতে সমীহ করে চলত। তাঁর এমনই বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল যে ছোট বড় সবাই তাঁকে মান্য করতেন, ভালও বাসতেন।

আমার স্মৃতিচারণ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, তবু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। সৈয়দদা "গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন" বইএ এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন।

বলেছেন, "আমাদের রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন অর্বাচীন বহু শাস্ত্র আছে, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোন প্রামাণিক শাস্ত্র নেই। এ শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই ছিল।

বহু অনুনয়—আবেদন করার পর তিনি সে শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।

কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি অপূর্ব। শুধু যে সেগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত দর্শনের সন্ধান মেলে তাই নয়, সেগুলিতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য, অমিত ঝঙ্কার—সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি একমাত্র কাব্যের উপেক্ষিতার ভাষা।"

আরও বলেছেন "এ শাস্ত্র তিনি কখনও সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা জানিনে"।

আমরাও তো জানিনা! শুনিনি তো কখনও, এবিষয়ে, কোন উল্লেখ!

দিনেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত এ কাজ—তা যত দুরূহই হোক—সমাপ্ত করা কি যায়না? বলা বাহুল্য এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা হলে ববীন্দ্রসঙ্গীতশাস্ত্র সমৃদ্ধতর হবে। এ বিষয়ে বিদগ্ধ জনেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পরিশেষে বাংলা গান সম্বন্ধে দিনুদার লেখা থেকে তাঁব মতামত উদ্ধৃত করে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন সমাপ্ত করছি।

"বাঙ্‌লা গানে যেখানে-সেখানে তান দেওয়া যায় না এইজন্যে যে, বাঙ্‌লা গানের কথারও একটা ঠাসবুনানী আছে; তার সুরকে বাদ দিলেও কথার নিজস্ব রস-সম্পদ রয়েছে। কাজেই একটা কথা শেষ করে বাকি কথাটা না বল্লে, উক্ত কথা বড় বিপদে পড়ে। কেমন হয় জান? যেমন, আমি যদি গাই "যদি বেলা বয়ে যায় গো বয়ে" আর তারপবে যদি ক্রমাগত বলতে থাকি "যায় গো বয়ে" তাহলে তার পরের দু লাইন "জেনো জেনো আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে" চীৎকার করে বল্‌তে থাক্‌বে—ওহে, থাম হে, আমার কথাটাও বলে ফেলো, তাহলে অর্থটাও সম্পূর্ণ হয় আর লোকেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

"আজকাল আর একটা কথাও উঠেছে যে, একটা গান বাববার একই রকম করে গাইলে এক-ঘেয়ে হয়ে যায়, তাই প্রতিবার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা দরকাব।

"এর সম্বন্ধে বলা যেতে পাবে ঐ একই কথা যে, পরিবর্তন পরিবর্ধন হিন্দি গানেতেই চলে; কেননা হিন্দীগানে কথা ও সুব মিলে একটা সুসম্বদ্ধ অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে না। গাইচি গুরুগম্ভীর রাগিণী—সুহা কানাড়া; তাতে কথা বসালুম "বল্‌মাবে চুনরিয়া ম্যায়কো লাল রঙাদে," অর্থাৎ "হে বল্লভ, আমার ওড়নাটা লাল রঙে বঙিয়ে দাও"। এ চুনরিয়াকে কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত ক্রমাগত টান মারা চলতে পাবে, কিন্তু ঐ সুরই বাঙ্‌লা কথায় খাপ খাইয়ে "নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও" গাইবার সময় সে টান সইবে না।

"আমি যখন শিল্পীব আসনে অধিষ্ঠান করে রসসৃষ্টি করছি, তখন তাব ছাপটা নষ্ট করে নিজের কারদানী দেখানোকে বলা যায় অনধিকাব বা মূঢ়তা। গোলাপ যে ফুটেছে, সে গোলাপই থাকবে, তাতে বেল ফুলের শুভ্রতা ও সৌরভ আশা করার মত এমন পাগ্‌লামী আর কিছু হতে পারে না। এক সুরে গাইলে যদি গান একঘেয়ে হয় তবে দোষ হয় গায়কের নয় শ্রোতার। আর দুইয়েরই যদি দোষ না থাকে, তবে তা Thing of beauty নয়, এবং Joy for ever দাবী সে করতে পারে না।…

"আমার মন বল্‌চে কথায় ও সুরে মিলিত একটি অখণ্ড সুসম্পূর্ণ রসসৃষ্টি করব। সেটা যখন হল, তখন দেখা গেল যে সুরে টোড়ির আমেজ এসেছে। এসে থাকে যদি তবে "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও"। সে টোড়ি যদি জীবনপুরী না হয়ে বোলপুরী হয়—তাতেই বা ক্ষতি কী?"

রমা চক্রবর্তী

২ ॥

দিনদার কথা লিখতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা মনে আসে, সেটা হল দিনদার অপূর্ব গান ও অপূর্ব গম্ভীর গলার সুর, যার কোনো তুলনা নেই। তিনি ছিলেন গান-পাগল আত্মভোলা লোক। গান ছাড়া দিনদাকে কল্পনাই করা যায় না। দেখেছি গান গাইতে গাইতে ভাবে বিভোর হয়ে দিনদা যেন কোথায় তলিয়ে যেতেন। সমস্ত মন প্রাণ যেন গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। তখন যে পরিবেশেব সৃষ্টি হত সেটা স্বর্গীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। দিনদার গানে গলার জোর অসাধারণ ছিল। প্রায় একশো জন ছেলেমেয়ের সমবেত কণ্ঠের উপরেও দিনদার সেই দরাজ গলা আলাদা ভাবে ভাসতে থাকত। না শুনলে এ জিনিস সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন। গুরুদেবের গলায় গানের সুর আসামাত্র না শেখালে ভুলে যাবাব সম্ভাবনা থাকত। তাই তক্ষুনি ডাক পড়ত গুরুদেবের সুরের ভাণ্ডারী দিনদাকে। শুধুমাত্র একবার সেই নতুন সুরটি শোনালেই সে সুব সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

দিনদা ছিলেন অসাধারণ লোক আবার আমাদেব অতি নিকটেব লোক। বড় সহজভাবে কাছে টেনে নিতে পাবতেন। স্নেহ মায়া মমতা ও ভালবাসা দিয়ে ঘিবে রাখতেন। দিনদাকে প্রথম দর্শনে কিন্তু ভয়মিশ্রিত ভাব মনে আসা বিচিত্র নয়। মনে পড়ে, গুরুদেবের সত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কলকাতায় ববীন্দ্রজয়ন্তীর কথা। সেই প্রথম দিনদার সংস্পর্শে আমি আসি। জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যাদের একলা গাইতে দেওয়া হয়েছিল তাদের সকালবেলা জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দিনদার কাছ থেকে গানটি শিখে নিতে হত। সমবেত রিহের্সাল হত সন্ধ্যাবেলা। একদিন সকালবেলা, অনাদি দস্তিদাবমহাশয় আমাকে নিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গেলেন। গিয়ে দেখি একটি প্রকাণ্ড হলঘরে ফরাস পাতা ও সেখানে ঘরের প্রায় অন্য প্রান্তে, বিশাল বপু নিয়ে, দিনদা একলা বসে আছেন, আমারি প্রতীক্ষায়। সেদিন তিনি আমাকে "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম" এই গানটি শেখাবেন। গুরুদেবের জন্মোৎসবে আমাকে এই গানটি একলা গাইতে হবে। আমি ঘরে ঢুকেই দিনদা একলা বসে আছেন দেখে ভয় পেয়ে দরজার কাছে বসে পড়েছি। দিনদা বললেন, "এগিয়ে এসো", আমি শুধু অল্প একটুখানি এগোলাম। আবার বললেন "কাছে এসো", এবারও আমি একটু-খানিই শুধু এগোতে পারলাম। তখন দিনদা হঠাৎ সেই বড় বড় চোখ গোল গোল করে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমি কি বাঘ?" সত্যি বলতে কি, সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন বাঘের সামনে এসে পড়েছি। যখন খেয়াল হল তখন দেখি উল্টোপথে এসে একেবারে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি। অনাদিবাবু অনেক বুঝিয়ে তবে আমাকে দিনদার কাছে সেদিন নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে পরে আমি দিনদার খুব কাছে আসতে পেরেছিলাম ও জানতে পেরেছিলাম দিনদার সত্যিকারের স্নেহময় রূপটি। দিনদাকে কাছে থেকে যেমন দেখেছি তারই দুএকটি কথা আজ লিখছি।

শান্তিনিকেতনে দিনদার নিয়মিত গানের ক্লাস ছিল দুপুর বেলা একটায় কলা ভবনে। দিনদার

গাড়িব হর্ণ শুনলেই ছুটতে হত। দুপুরে সবেমাত্র একটু ঘুমেব আমেজ এসেছে, এমন সময় ঐ গরমে শ্রীভবন থেকে খালি পায়ে হেঁটে কলাভবনে যেতে গিয়ে দিনদাকে মনে মনে অনেক বকতাম ও ঢুলু ঢুলু অবস্থায় ক্লাসে গিয়ে উপস্থিত হতাম। দিনদার গান আবম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ঘুম কোথায় ছুটে পালিযে যেত। দিনদার বাড়ি 'সুবপুরী'তে গানের একটা বিশেষ ক্লাস হত সকালবেলা। অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাতে থাকতেন। এই সময়টির অপেক্ষায় আমরা উৎসুক হযে থাকতাম। দিনদা মজলিসী লোক ছিলেন। অনেক মজাব মজার গল্প তখন আমাদেব বলতেন। এমন কি একদিন হঠাৎ আমায় বলে বসলেন "তুই যদি পঁচিশ বছব আগে আমাব জীবনে আসতিস তো তোকে নিয়ে আমি পালিযে যেতুম।" এমনি ভাবে প্রায় আধঘণ্টা-কাল নানা বকম হাসি ঠাট্টাব মধ্য দিয়ে আমাদেব কাটত। 'সুবপুরী'ব জানলাগুলো চওডা ও নীচু হওযাতে আমরা টপকেই ঘবে ঢুকতাম ও জানলাব উপব বসে গান শিখতাম। দিনদা একটা চেয়ারে বসতেন ও খালি গলায় গান শেখাতেন। সামনে একটা টেবিল থাকত। গল্প শেষ কবে হঠাৎ চোখ বুজে গানেব ভিতর নিমগ্ন হয়ে তিনি গান ধরতেন। আমরা মুগ্ধ হযে শুনতাম সেই গান ও তুলে নেবাব চেষ্টা কবতাম। সেই বাকী অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু সুন্দরভাবে তিনি আমাদের গানটি শিখিযে দিতেন। দিনদাব গান শেখাবার পদ্ধতি ছিল পুরো গানটি বাববাব গেয়ে যাওয়া। এক লাইন দু লাইন গেযে দিনদা কখনো গান শেখাতেন না। গান শেখা হযে গেলে গানেব বই সামনে বেখে গাইতে দিতেন না।

একবাব কেঁদুলি মেলায় দিনদা আমাদের নিয়ে গেছেন। গভীর রাতে সত্যিকারেব বাউলরা একতাবা বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। মনে আছে সেইসময় এক সন্ধ্যাবেলা একটি গাছের গুঁডিতে ঠেসান দিয়ে বসে দিনদা গান ধবলেন 'গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে'। এই গানটি সেদিন তিনি আমাদেব শেখালেন।

আব একবাব পৌষমেলায় বুড়ী (গুরুদেবেব নাতনী নন্দিতা কৃপালনী) ও আমি ঘুবে বেড়াচ্ছি। একটা মিষ্টিব দোকানেব সামনে এসে আমাদের চোখ আটকে গেল। দুজনের হাতে পয়সা সামান্য—তাতে ইচ্ছামত কেনা চলত না, অথচ লোভ অনেক। মনস্থিব কবতে না পেবে জল্পনা-কল্পনা করছি, এমন সময় পেছন থেকে এসে দিনদা আমাদেব দুজনকে জড়িয়ে ধবে বললেন, "কিরে পয়সা নেই? কি খাবি বল!" আমবা যেন হাতে চাঁদ পেলাম। দিনদা যে আমাদেব বন্ধু! অসঙ্কোচে তখনই লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হয়ে গেল। দিনদা তখন দোকানদাবকে বলে দিলেন, "ওরা যা খাবে আমার নামে লিখে রেখো।" তাবপর আমাদের বললেন, "আর কি করবি?" আমাদের খুব সখ নাগরদোলায় চড়ব। দিনদার দয়াতে আমাদের সে ইচ্ছাও পূর্ণ হল।

দিনদা ছিলেন খাদ্যরসিক, ভালোমন্দ খেতে খুব ভালোবাসতেন। এমনকি লংকা পেঁয়াজ রসুন দেওয়া খুব ঝাল ও টকটকে লাল শুকনো মাছের রান্না যাকে আমরা সিলেটীরা শুটকী মাছ বলি, দিনদার বিশেষ প্রিয় ছিল। বলতেন "আমার কত কত সিলেটী ছাত্রছাত্রী আছে, আমি নিজেই সিলেটী হয়ে গেছি।" নিত্যসঙ্গী কমলবৌঠান ছিলেন যেমন সুন্দরী তেমনি মিষ্টভাষী ও তেমনি

তাঁর অপূর্ব রান্নার হাত। আমরা সেই লোভে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতাম এবং তাতে কখনো বঞ্চিত হইনি।

দিনদার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি কলকাতায় আছি জেনে কমলবৌঠান ডেকে পাঠিয়েছিলেন ও বলেছিলেন, "তোদের দিনদা তোকে কত ভালবাসতেন, তাই আমার ইচ্ছা এই উপলক্ষে ওঁর লেখা একখানা গান তুই সেদিন করিস।" সে গানটি অনাদি দস্তিদার মহাশয় আমাকে তখন শিখিয়েছিলেন ও আমি গেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি নূতন গানের সুর শিখিয়ে দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা দিনদার ছিল। একবার কলকাতায় বর্ষামঙ্গল উৎসব যেদিন সন্ধ্যাবেলা শুরু হবে সেদিন সকালবেলা গুরুদেব একটা গানের সুর বদলে দিলেন ও বললেন "দিনু আজই গাইয়ে দাও"। দিনদা রাগে গজগজ করতে করতে শেখালেন এবং সেটি গাওয়াও হল। কিন্তু মনে আছে গুরুদেবের ওপর রেগে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন "ইচ্ছে করে ববিদাকে তালাচাবি দিয়ে ঘবে বন্ধ করে রাখি।" দিনদা গুরুদেবের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন একথা সকলেই জানেন কিন্তু তখন খুব কম লোকই একথা জানতেন দিনদা নিজে অনেক গান ও কবিতা লিখেছেন, সুর দিয়েছেন। দিনদা কিন্তু ধরা পড়ে গেলে কুণ্ঠিত হতেন। এভাবেই দিনদা এত বড় গুণী হয়েও নিজেকে সব সময় আড়ালে বাখতেন। শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার পবও দিনদা প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ-খবব কবতেন ও মাঝে মাঝে মজা করে কবিতায় চিঠি লিখতেন। সেই কবিতায় লেখা তিনখানি চিঠি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল।

অমলা রায়চৌধুরী

উপরের রচনা দুটি ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে দিনেন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবের জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনের সভায় পঠিত হয়।

দিনেন্দ্র-স্মৃতি

কিরণশশী দে

পরিচিত কেউ যতক্ষণ অত্যন্ত কাছাকাছি সীমানার ভিতর থাকেন, ততক্ষণ কিন্তু আমরা অনেকেই তাঁর যথোচিত মূল্য বা মর্যাদা দিই না, অথচ সীমানার বাইরে চলে গেলে সেই কাছে থাকা মানুষের অভাবটা বড় একান্তে অনুভব করি। কখনো-সখনো সেই অভাব তীব্র বেদনার রূপ নেয়, তবু কেন জানি ঐ বেদনাটুকুকেই স্মৃতির ভাণ্ডারে সযত্নে আগলে রাখতে চায় আমাদের মন।

এই তো কোন এক দুপুরে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে গিয়েছিলাম যেমন যাই তেমনি প্রতিদিনকার মতো ছবি আঁকতে; সঙ্গে ছিল ছোট্ট একটা এসরাজ। তখন কলাভবনে অন্যদের আসার সময় হয়নি, একা নিরিবিলিতে বসে ঐ এসরাজ বাজাচ্ছিলাম। এক ফাঁকে মাথা তুলে চেয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দিনুদা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওস্তাদ দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গীতগুরু, আরো বিবিধগুণে গুণবান, কিন্তু বাইরে থেকে সে সব বুঝবার কারো উপায় নেই; কারণ প্রভূত ধন মান যশ ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি যেন এ-সবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। সোজা কথায় তাঁর অতিশয় ভদ্র, নিরহংকার ও মিশুক স্বভাবের জন্যে আশ্রমের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই তাঁকে ভালবাসেন, ডাকেন 'দিনুদা' কিংবা 'দিনুদা' বলে,—আমিও ডাকি। রবীন্দ্র-নাথের গানের বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত স্বরলিপিকার বলে খ্যাত এই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ই কাকে খুঁজতে এসেছেন কলাভবনে, আর আমাকে সামনে পেয়ে আমার কাছে সন্ধান নিচ্ছিলেন ওঁর।

—"ঠিক করে তো বলতে পাচ্ছি না কখন আসবেন উনি"—জবাবটা করে দায়সারা গোছে দিয়ে আমি শুধু বোবার মত তাকিয়ে ছিলাম দিনুদার মুখের দিকে। তিনি বললেন, "বেশ তো বাজাচ্ছিলে এসরাজ। এটা ভাল করে শিখে নাও। কিন্তু তোমার ঐ হারমোনিয়ম বাজনা বড় অশ্রাব্য হয় কেন? শিখবার কোনো চেষ্টা করোনি কখনও?"

দিনদা নিজে থেকেই পাশে বিছানো একটা মাদুরের ওপর আসন করে বসে বললেন সাগ্রহে, "আমি দেখব তোমার আঁকা ছবি, এখানে যা আছে।" তারপর বেশ খানিকক্ষণ আমার আঁকা ছবি ড্রয়িং ইত্যাদি দেখলেন নেড়ে-চেড়ে। এসব দেখতে তাঁর ভাল লাগছিল অবশ্যই,—আমিও উৎসাহ পাচ্ছিলাম তাঁকে দেখাতে। আমার মনে পড়ল, ইত্যবসরে কোন এক ছুটিতে কলকাতা জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলাম অবনীন্দ্রনাথের কাছে এগ্‌জিবিশন উপলক্ষে ছবি দেখাবার জন্যে, তখন সামনে দিনুদাও

ছিলেন, ছবি সম্পর্কীয় আলোচনায়ও যেন যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সকল ঘটনাই এখন কথায় কথায় তিনিই মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে জানাচ্ছিলেন, তাঁর নিজেরও একদা ছবি আঁকার শখ ছিল খুব, বললেন, "তোমাদের পূর্ববঙ্গের একটি ছেলের উৎসাহে তুলি ধরেছিলাম হে কিরণ, জান ? রং-চংও কিনেছিলাম অনেক, কিন্তু হল না" — বহু পিছনে ফেলে আসা কোন্ এক অবহেলিত মুহূর্তের দিনুদার কণ্ঠনিঃসৃত এই ছোট্ট করুণ উক্তিটুকু বড়ো দুঃখের সুরের সঙ্গে আজ এইক্ষণে আমার কানে এসে অনবরত বাজছে ; যেদিন কাগজে খবর বেরোল : "পরলোকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ ভারতীয় সঙ্গীতের আজীবন সাধক॥" এমন এক আকস্মিক ও মর্মান্তিক খবর জানার জন্য কি আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম ? কাগজখানা পড়তে গিয়ে অক্ষরগুলো সব চোখের সামনে ঝাপ্‌সা হয়ে আসছিল। ভিতরে কান্না পাচ্ছিল এই ভেবে যে, কত কাছে কত সহজে দিনুদাকে পেয়েছিলাম আর তো তাঁকে কখনও পাব না ! ফাঁকি দিয়ে তিনি চলে গেলেন কোথায় কোন অজানা জগতে !

রবীন্দ্রনাথের বড় গৌরব ছিল তাঁর এই সঙ্গীতবিদ্ নাতিকে নিয়ে, বলতেনও 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ'। কবিপ্রদত্ত এই আখ্যাটি অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মহলে বোধ করি কারো অজানা নেই। দিনেন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরাও শুনেছি কবি-গুরুর আশীর্বচন :

'রবির সম্পদ হোতো নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।'

এখানেই এর সমাপ্তি নয়, এর সুস্পষ্ট বাস্তব ব্যাখ্যাও কবি আবার নিজে করেছেন, অবশ্য দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে সখেদে : "চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি। দিনেন্দ্রের চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশ বিলুপ্ত হত। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমনকি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল।"

এই পরিচিতির বাইরেও দিনেন্দ্রনাথের বহুমুখি প্রতিভার উপর আলোকপাত করে অনেক যোগ্যজন লিখেছেন অনেক কিছু এবং আজও লিখছেন। আমি এই অবকাশে তাঁর প্রতি লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা একটু বলব।

সঙ্গীতগুরু দিনেন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতনে গান শিখতে শুরু করি ১৯২৯ সালে, তখন আমার বয়স মাত্র উনিশ। শেষের দিকে যদিচ ১৯৩৩ কি ৩৪-এ তিনি আশ্রম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন, তবু তাঁর পরলোকগমনের পূর্ব পর্যন্ত নানা উপলক্ষে বহুবার তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি আমি। বিশেষ করে গান-শিক্ষার সূত্রেই যেমন শান্তিনিকেতনে তেমন কলকাতায়ও সময়ে-অসময়ে চেনা-অচেনা অনুরাগীদের সঙ্গে করে তাঁর কাছে গিয়ে যখন যা আবদার করতাম, তিনি তা সানন্দে রক্ষা করতেন। তখন দেখতাম, সঙ্গীতজগতে বিশিষ্ট শ্রেণীর জ্ঞানী গুণী ও বোদ্ধা হিসাবে

সুপরিচিত হয়েও নিজেকে তিনি কখনও কারো সামনে জাহির করতেন না, দিনেন্দ্রনাথের এই অসামান্য রকমের আত্মপ্রচারবিমুখ সংযত মনোভাব আমার সেই অল্প বয়সের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। সেই অনুভূতি বড় নিবিড়, আজ নিজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও অনাহতরূপে বর্তমান আছে।

তবে শান্তিনিকেতনে গান শিক্ষাকালীন আমার হারমোনিয়ম বাজনা প্রসঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের অকাট্য সমালোচনা আমাকে পরবর্তী জীবনে প্রচুর সাহায্য করেছে নানা পরিস্থিতিতে। বিশেষত হারমোনিয়ম যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কীয় বিবিধ উপদেশাবলী হাতে-কলমে জানবার বা বুঝবার যে সুযোগ সরাসরি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা আমার জীবনে এক দুর্লভ সঞ্চয়। সে কথা বলবার আগে এই সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের খানিক আপনাদের এখানে শোনাতে চাই।

ছোটবেলায় খালিগলায় মুক্তভাবে গান গাইতে বেশি ভাল লাগত। তাহলেও যে তের-চোদ্দ বছর বয়সে শখ করে হারমোনিয়ম বাজাতে শিখেছিলাম সে কোনো বাঁধা নিয়ম মেনে শেখা নয়। ক্রমে ক্রমে হারমোনিয়ম আমার অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল একদিন। হারমোনিয়ম বাজনায় আমি নিঃসংশয়রূপে একজন পাকা ওস্তাদ বনে গেছি আমার আবেষ্টন আমার মনে সেই অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু এই অলীক অনুভূতিটাই যে ইতিমধ্যে তলায়-তলায় আমার ক্ষতি করে বসেছে, সেটাও হাতে কলমে বুঝবার জানবার সুযোগ পেলাম শান্তিনিকেতনে এসে স্বয়ং পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং সঙ্গীতগুরু দিনেন্দ্রনাথেরই অপার কারুণ্যে। প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারলাম, কী কারণে গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম যন্ত্রটি ব্যবহার করতে সবাইকে ওঁরা বাধা দেন।

সময়টা বোধকরি ছিল ১৯৩০ সাল। কবি জসিম উদ্দিনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে একদিন দিনুদার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনই কবি জসিমের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শেষ হলে দিনদার কাছে আমি একটু ব্যক্তিগত কথা তুলেছিলাম, "আজকে আমাদের ক্লাসে যে গানটা আপনি শিখিয়েছিলেন, সেটা একবার আপনাকে শোনাতে চাই।"

গান গাইতে গিয়ে গলা কাঁপছিল আমার। পাশে বসে কবি জসিম অভিমত শোনালেন, আমি নাকি ভয় পেয়ে গেছি। দিনদা আপত্তি জানালেন, "এই কম্পন ভয়ে নয় অন্য কারণে হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখো, গানের সুর-মাত্রা এসব কিন্তু ঠিক আছে ওর।"

গান শেষ হতে ঈষৎ অর্থপূর্ণ মৃদুহাস্যে দিনেন্দ্রনাথ বললেন, "ঐটে বাজিয়ে পারবে গাইতে?"

হাতে যেন স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটল। সানন্দে এগিয়ে গিয়ে ধরলাম হারমোনিয়ম। এবার আর গলা কাঁপল না, কণ্ঠস্বরও হল অধিকতর সতেজ, সবল। কিন্তু একটু গাইতে না গাইতে আমাকে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন তিনি, "বুঝতে পেরেছি,—এই হারমোনিয়ম বাজিয়েই গান গাওয়া তোমার অভ্যাস, না?" অতঃপর গম্ভীরমুখে বললেন, "আজ থাক। সকালের দিকে চলে এসো একবার যে কোনো দিন।"

—"তখন তো মেয়েরা আসে শুনেছি গান শিখতে আপনার কাছে!"—"তা আসুক না তাতে কি!" বলে আগের মতই শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিলেন দিনদা, "তুমি এসো।"

মন আমার খুশিতে ভরে উঠল। কবিকে নিয়ে চলে এলাম।

যে হারমোনিয়মে গান গাইলাম এটা একটা আধভাঙ্গা সিঙ্গেল রীডের যন্ত্র, কিছুকাল অত্যন্ত অযত্নে পড়েছিল আমাদের ছাত্রাবাসে। আমি সুযোগ পেলেই সেটা ব্যবহার করতাম। বিশেষ করে বিকেলের দিকে আমাদের মধ্যে অনেক সময় নূতন পুরাতন গানের মহড়াও চলত ঐ ভাঙ্গা হারমোনিয়ম সহযোগে। দিনুদা প্রায় রোজই বিকালে আশ্রমের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন পায়ে হেঁটে, নয়ত তাঁর মোটরে চড়ে। তখন আসা যাওয়ার পথে আমাদের এমনতর গানের মহড়া তাঁর নজর এড়াত না, বলতেনও করুণকণ্ঠে কখনো-সখনো, "ওই বাজনাটা বন্ধ করে দিও হে।" কিন্তু সে বাজনা বন্ধ হত না। যন্ত্রটির প্রতি যে আমার অতিরিক্ত আসক্তি সেটা তিনি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু হারমোনিয়ম হাতের কাছে থাকলে সেটা ব্যবহারের বেপরোয়া স্বভাব তো আর রাতারাতি বদলানো যায় না,—কাজেই অনন্যোপায় হয়ে এটা কোনো এক সুযোগে দিনুদার বাড়িতে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। আজকে তো দেখছি, বেশ একটু বিরক্ত কণ্ঠেই সুস্পষ্ট অভিমত জানালেন যে হারমোনিয়মই আমার দোসর। এই বিরক্তিটুকু আন্দাজ করতে পারলেও হারমোনিয়ম বাজাতে যে তিনি কোন্ কারণে আপত্তি করতেন সেটা আমি বুঝব কী করে? বোঝার কোনো জ্ঞানগম্যিই তো ছিল না আমার।

দিনেন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো সকালের দিকে তাঁর ওখানে গিয়ে দেখলাম অন্য কেউ আসেনি। যখন তিনি গাইতে বললেন, তাঁরই শেখানো একটি গান গাইলাম,

পূবাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি॥

খালি গলায় গেয়ে শোনালাম। অর্ধেকটা গাইবার পর তিনি আমাকে থামতে বললেন।

তারপর বললেন হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাইতে।

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে ধরলাম গান, আর সজোরে। গাইলাম সম্পূর্ণটা।

আমার নিষ্ঠা আর আগ্রহের পরিমাণ অনুমান করতে নিশ্চয়ই দিনেন্দ্রনাথের অসুবিধা হচ্ছিল না। তাই হয়তো এমন শিষ্যকে হতাশ না করে তাড়াতাড়ি পথে টেনে নেবার উদ্দেশ্যেই যে-কথা বললেন দীর্ঘকাল পরে অক্ষরে-অক্ষরে অবিকল মনে থাকার কথা নয়;—নানা রকমের প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে অনেক জবাব পেয়েছিলাম। সেগুলিরই মূল তাৎপর্য একটানা ভাবে এখানে লিপিবদ্ধ করছি। তিনি বলেছিলেন: হারমোনিয়ম হাতে পেলে গলায় যেমন জোর পাও,—তেমনি খালি গলায় গান গাওয়া অভ্যাস করা চাই। তাহলেই বাহাদুরি। লক্ষ্য রাখবে,—হারমোনিয়মটা ছেড়ে দিলেই কিন্তু গলার আওয়াজ তোমার কমে যাচ্ছে বারবার। আবার অন্যদিকে, স্বরগ্রামের ওপর স্পষ্ট আধিপত্য নেই বলে ঐ খালি গলায় গান গাইবার সময় নিজের কণ্ঠস্বরকে যে কোনো-কোনো জায়গায় ভয়ে ভয়ে চাপছ—

এই অভ্যাসটি অতি অবশ্য পরিত্যাজ্য। মনে রাখতে হবে, গান সকল অবস্থাতেই গলা আর মুখ খুলে সহজভাবে গাইতে হয়। আর তাই জন্যেই তো দীর্ঘ স্বরসাধনার উপদেশ আছে সঙ্গীতশাস্ত্রে। আমাদের দেশে গীতশিক্ষার্থীদের গোড়া থেকেই কণ্ঠে স্থিরতা আনতে হয়—পরিষ্কার এবং স্পষ্ট করে 'আ' উচ্চারণের মাধ্যমে।

তখন শান্তিনিকেতনে গানশিক্ষার্থীদের কণ্ঠসাধনার জন্য কোনো পৃথক্ রকমের বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিশেষত গুরুদেবের গানের চর্চার ক্ষেত্রে ছিল লক্ষণীয় রকমের স্বাতন্ত্র্য। তাছাড়া কণ্ঠসাধনার মর্যাদাবোধ সম্পর্কে বাঙালীদের ধারণা যে সাধারণত একটু উৎকট,—এটা বাল্যাবধি আমি শুনে আসছিলাম। এঁরা যেন চান, এ-রস ঢালার জন্যে এমন এক কণ্ঠসাধনার প্রণালী হবে যা শুধুমাত্র বাংলা গানেরই উপযোগী—বেশ খানিকটা পেলবতা ঘেঁষা, হিন্দুস্তানী স্বরসাধনের বাঁধা বিজ্ঞানসম্মত কঠিন প্রণালী নাকি এতে ঠিক খাপ খায় না, গানে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে! বলা বাহুল্য আমি বাঙালী, উপরোক্ত চিন্তাধারায় সজ্ঞানে-অজ্ঞানে প্রভাবিত। শান্তিনিকেতনে এসে তাই কেবল কানে শুনে-শুনে সকলের সঙ্গে কোরাসে গেয়ে যেতাম গুরুদেবের গান।—এই মামুলী শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম আমি। সুতরাং মূলত কণ্ঠসাধনার অতি সামান্য a-b-c-d সম্বন্ধেই যে আমার বাস্তবজ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল এটা আজ অকপটে স্বীকার করতে বাধা নেই। তাই মনে পড়ছে,—সেদিন দিনুদার সঙ্গে তর্কও করেছিলাম কত, বলেছিলাম "আ-আ করা দিনরাত সারাক্ষণ, এ-সব তো ওস্তাদদের ব্যাপার!"

—"না হে না, 'গানকে ভালবেসে আপন করে ধরে রাখতে চাও যদি, তাহলে তোমাকে একদিন এ জিনিস আয়ত্ত করতেই হবে। ভেবে দেখো, আমাদের গলাটা গান গাইবার একটা চমৎকার যন্ত্র,—এতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু এই যন্ত্রকে নিয়মিত মেজে-ঘষে ঐ কাজের উপযোগী করে নিতে হয়। এই মাজা-ঘষার কাজটাকেই বলে কণ্ঠসাধনা। এ সাধনা আনন্দের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে করতে করতে যেদিন আত্মতৃপ্তি আসবে, তখনই কণ্ঠ মার্জিত হবে। এটা কখনো আচমকা হয় না। এই সাধনাকে এড়িয়ে গিয়ে অমার্জিত কণ্ঠে একটু-আধটু গান গাওয়া যায় বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ গাইতে গেলে ক্লান্তি আসে। অথচ গলা তৈরি থাকলে একটা গানই তুমি অক্লান্তভাবে গেয়ে যেতে পার ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর শ্রোতার কানটিও যদি তেমনি তৈরি থাকে তাহলে তার কাছেও তা শুনতে সর্বক্ষণ ভালো লাগবেই।"

প্রাসঙ্গিক মূল্যবান আরো বহু কথা বলেছিলেন তিনি, কয়েকটি বই পড়তেও নির্দেশ দিয়েছিলেন; তাঁর কাছ থেকে সবুজপত্র পত্রিকা উপহার পেয়েছিলাম অন্য একদিন, তখন স্বরলিপি-প্রসঙ্গও উঠেছিল। সেদিন দিনুদার উপদেশ শুনে মনে হচ্ছিল,—এই মন্ত্রটি তাঁর নিজ অন্তরে সজাগ আছে বলেই তিনি দিব্যি গান গাইতে পারেন আমাদের মত চপলমতিদের সঙ্গে বারবার, অনর্গল। আমরা কখনো-কখনো বটে ক্লান্ত হই, একটা গান কিছুদিন বারবার গাইলে পর আমাদের কাছে সেটা পচে যায়,—তখন পুরাতন আর নূতন গান নিয়ে বাছাবাছি শুরু করি;—কিন্তু কৈ দিনুদাকে তো আজ পর্যন্ত কখনো ক্লান্ত বা বিরক্ত হতে দেখলাম না! সব গানই তাঁর কণ্ঠে নূতন হয়ে ওঠে—প্রফুল্ল চিত্তে গেয়ে শোনাতে পারেন তিনি যখন তখন।

দিনুদা আরো বলেছিলেন, "স্বরস্থানের উন্নতি করার ইচ্ছা থাকলে সার্গমগুলি বিভিন্ন স্বরবর্ণের সাহায্যে গাওয়ার অভ্যাস করতেই হবে। অর্থাৎ কণ্ঠে কেবলমাত্র 'আ'-এর উচ্চারণ নয়,—প্রত্যেকটা স্বরবর্ণের যথা, 'ই' 'উ' 'এ' সব কয়টারই বিশুদ্ধ উচ্চাবণ সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করা দরকার—বিশেষ করে বাংলা গানের বেলায় তা নিশ্চয়ই। একাজ ধৈর্য ধরে যদি নিয়মিত কবতে পার, কণ্ঠস্বরে স্থিরতা আসবেই। গলা যে তোমার মাঝে মাঝে কেঁপে যায়, সেটাও তো ঐ তোমার কণ্ঠস্বরে স্থিরতা নেই বলেই।" দিনুদা ক্ষণকাল থেমে ফের বললেন, "আর এক কথা, —accent গুলো তো কৈ ঠিক ঠিক ফোটাতে পারলে না বাজনায়, তাতে যে হাবমোনিয়ম যন্ত্রটাই তোমার গাওয়া গানকে আগাগোড়া ডিস্‌টার্ব করেছে—তা টেব পেয়েছ ?"

এবার সত্যসত্যিই ঘাবড়ে গেলাম। একদিন আমাদের কলেজ প্রিন্সিপ্যাল নলিন গাঙ্গুলী মশাই আমাকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে সস্নেহ মৃদু অনুযোগ জানিয়েছিলেন আমারই সামনে, বলেছিলেন, এ ছেলেটা আমাদেব কলেজ-হোষ্টেলে বিশেষ করে আমাব ঘরের পাশে সারাক্ষণ গান আর হাবমোনিয়ম বাজনা নিয়েই আছে, পড়াশুনা করে কম। বাজনাটা কিছুদিন বন্ধ রেখে পড়ায় লেখায় মন দিলে ওর ভাল হত। দেখুন তো একে আপনি নিজে কিছু বোঝাতে পারেন কি না।"

গাঙ্গুলীমশায়ের এই অনুযোগ শুনে গুরুদেব তাঁর স্বভাবসুলভ স্মিতহাস্যে আমার দিকে তির্যক ভঙ্গিতে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন শুধু, কিন্তু মুখে তখন কিছুই বলেন নি। আমি সেই ফুরসতে ব্যাপারটা হাল্‌কা করে দেবাব উদ্দেশ্যে গুরুদেবকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এখানে দেখি হারমোনিয়ম বাজনা কেউ সহ্য করতে পারেন না! আচ্ছা বলুন তো গানের সঙ্গে হাবমোনিয়ম বাজানো কি কোনো বিশেষ অপরাধ? আর আপনিই কি 'ডোয়ার্কিন্'-কে প্রশংসা কবেন নি এই হারমোনিয়ম তৈরির জন্যে?" গুরুদেব এ-সবের সোজা জবাব না দিয়ে পাল্‌টা প্রশ্ন করেছিলেন আমাকে: 'তুই এসরাজ, সেতার, বেহালা, সারঙ্গী ওসব বাজাতে জানিস?"—"আজ্ঞে না।"—"কেন?"—"ও-সব বাজাতে তো শিখিনি কখনও—চেষ্টাও করিনি শিখতে।"

—"আর হারমোনিয়ম বাজনা শিখেছ বুঝি? কোথায়, কোন ওস্তাদের কাছে?"—গুরুদেবের কণ্ঠে বেশ উষ্মা প্রকাশ পেল। আমি ভয়ে লজ্জায় চুপ করে গেলাম। প্রশ্নের কোনো সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছি না—ভিতরেব দর্পও আর নেই। তিনি যে আমার বাক্‌প্রগল্‌ভতায় বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন সেটাও কিন্তু গোপন রাখেন নি,—'তুই' সম্বোধনকে হঠাৎ 'তুমি'-তে রূপান্তরিত করা যে এর অন্যতম লক্ষণ- তা আমরা সবাই জানতাম। যাইহোক অল্পক্ষণ বাদেই গুরুদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে বেশ সময় নিয়ে আমাকে বুঝিয়ে অনেক কিছু বললেন; আমি তা যেরকম ভাবে বুঝেছিলাম তার সারাংশ এই:

– হারমোনিয়ম যন্ত্রও আগে শিখে নিয়ে তারপর বাজাবি। তা নৈলে এর বাজনা বড়ো উৎপাত সৃষ্টি করে। বাইরের শ্রোতা সকলে তা যথাযথ বোঝে না। এদের অধিকাংশই দেখবি সঙ্গীত-বিজ্ঞানে নির্বোধ থাকে, কাজেই এদের বাহবায় কান দেওয়া অনুচিত। এতে কান দিলে কিন্তু

গায়কের, বিশেষত শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ হবারই বেশি আশংকা। অপটু অশিক্ষিত হাতের হারমোনিয়ম অনেক বড় বড় গায়কের গাওয়া ভাল সুন্দর গানকে এবং সুরকে পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়, কারো কারো স্বরস্থান শ্রুতিস্থান ঐ ধরনের আওয়াজ শুনে ভোঁতা হয়ে যায় চিরকালের মতো। তার উপর, হারমোনিয়ম যদি বেসুরো থাকে তাহলে তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠাও তো সকলেব পক্ষে সহজ কাজ নয়।

এই সকল কথাব তাৎপর্য যে কত গভীর পরিষ্কার ভাবে আমার মস্তিষ্কে না ঢুকলেও আমি কিন্তু আর তর্ক করিনি তাঁব সঙ্গে। আজকে দিন্‌দার মুখেও প্রায় ঐ একই অভিমত শুনতে পেয়ে এব মূল তাৎপর্য উপলব্ধির প্রত্যাশায় তাঁব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দিন্‌দা বললেন, "যে গানটা আগে গাইছিলে সেটাই শুধু শুধু ঐ হারমোনিয়ম যন্ত্রে বাজাও তো।

বাজালাম ঐ গানেব মাত্র দুটো লাইন। বাজনা শুনে তিনি একটুও খুশি হলেন না। তবু উৎসাহ দিয়ে বললেন, "ব্যাস্ এবাব ঐ দুটো লাইনই আবার বাজাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে এর সার্গম গাইবে,—যেমন করে বাজাচ্ছ ঠিক তেমনি করে।"

আমি ইতস্তত করছিলাম, তিনি সাহস দিলেন: "ভয় পেও না। সূক্ষ্ম স্পর্শস্বরগুলো বাদ দিয়ে মোটামুটি ভাবে গাও। ভুল হলে আমি শুধবে দেব'খন। আব নাহলে আগের মতো শুধু বাজিয়ে যাও হাবমোনিয়ম এবং চেয়ে দেখ, আমি কী ভাবে তোমার বাজনাব সঙ্গে সঙ্গে এর সার্গম লিখছি এই কাগজে।"

আমি বাজাতে আমার বাজনাকে হুবহু অনুসরণ করে দিনদা এব সার্গম গেয়ে নিখুঁত স্বরলিপি লিখতে লাগলেন। তাহলেও এই জায়গাতেই যেন হঠাৎ হঠাৎ ঘা খাচ্ছি, মনে হচ্ছে কাজটা গোঁজামিল দিয়ে সেরে ফেলবার চেষ্টা চলছে আপ্রাণ আমার মধ্যে। যাইহোক দিন্‌দা আমার সমর্থন নিয়ে অর্থাৎ আমার বাজনা মতন তাঁর সার্গম গাওয়া ঠিক হল কি হল না আমাকে তা জিজ্ঞেস করে করে কাগজে টুকে নিচ্ছেন ঐ সার্গম আমারই চোখের সামনে। সার্গমটি লিপিবদ্ধ হল এই ভাবে:

II { মা -পা -া মা | জ্ঞা রা মা -া | রা সা রা সা | পা -া -া -া | (সা পা -া -া
| া -া ধা পা | মা গা মা গা | মা গা মা পা) } | মা পা -া -া | -া -া -া মা |
পা -ধা র্সা ধা | ণা -া -া ণা | ণা দা -া পা | -া -া পা মা | পা -ধা ণা -া |
-া -া র্সা -া | ণা দা -া পা | -া -া পা মা | পা ধা ণা র্সা | ণা -দা দা -পা II

এই লিপিবদ্ধ সার্গম অনুসারে দিন্‌দা এবার আমাকে গানটা হারমোনিয়ম বাজিয়ে পুনশ্চ গাইতে বললেন। আমি আগের মতই গেয়ে গেলাম বয়সোচিত উদ্ধত মস্তকে, অর্থাৎ ঐ লিখিত স্বরলিপির দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি বা মন দিলাম না। সুতরাং গলদটা যে কোথায় তা আর ধরা হল না। ...দিনদাও নীরব। চেয়ে দেখি, আমার দিকে তিনি চোখ বিস্ফারিত করে অপলক তাকিয়ে আছেন, —তাঁর এমনতর দৃষ্টিতে সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হত। বলাবাহুল্য আমিও ভয় পেলাম, মস্তক আমার

অনুদ্ধত হল। দিন্‌দা গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন: "লেখা সার্গমটুকুর উপর মন দিয়ে গাও। বেশি তাড়াহুড়ো করো না। ভুল যদি এতে কিছু বের হয়, তা নিজে নিজে ঠিক করো। আমিও এই সার্গম কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু লিখতে পারিনি এবং কেন যে পারিনি সেটাও এই সুযোগে বুঝতে চেষ্টা কর।"

এ সব নির্দেশ পেয়ে আমি তখন আরো ঘাবড়ে গেছি, বসে আছি নিশ্চুপ। আমার এই বিমূঢাবস্থায় দিন্‌দা তাঁর হাতের কলমটা এগিয়ে দিলেন আমাকে, তার পর ঐ লিখিত সার্গমের তলায় তলায় গানের কথাগুলি যেমন গাইছিলাম তেমনি পরপর বসিয়ে যেতে বললেন।

একাজে খানিকটা চেষ্টা করতে গিয়েই বুঝতে পারলাম গলদটা কোথায়। গানের কথাগুলি যে এতে ঠিক ঠিক খাপ খাচ্ছে না নিজের মনই তা বলে উঠল। দিনদা অবশ্য এই সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করলেন না। প্রসঙ্গত বলি দিনেন্দ্রনাথ যখন গান শেখাতেন প্রায়ই লক্ষ্য করেছি আমাদের কোথাও ভুল হলে, সেটা ভুল হয়েছে—এইভাবে সরাসরি মন্তব্য জানিয়ে তিনি আমাদের কারুকেই সাধারণত নিরুৎসাহ করতেন না; বরং সেই ভুল গায়গাটা শুদ্ধ আকারে নিজে গেয়ে ছাত্রছাত্রীদের বারবার শোনাতেন। তার দ্বারাই ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের শুধরে নিতেন।

দিনেন্দ্রনাথ নীরবে হারমোনিয়মটা আমার কাছ থেকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বাজিয়ে দেখাতে লাগলেন কী ভাবে ঐ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। আমি বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলাম, হারমোনিয়মের পর্দার উপর তাঁর আঙুলের প্রতিটি স্ট্রোক কত স্পষ্ট আর প্রবল, অথচ মধুর! ভাঙ্গা অকেজো যন্ত্রটাই যেন দস্তুরমতো প্রাণ পেয়ে কথা বলছে। দিনেন্দ্রনাথ বললেন যে, হারমোনিয়ম যদি একান্তই বাজাবার শখ হয়, তাহলে ঐ যন্ত্রের পর্দাগুলির উপর আঙ্গুল ব্যবহারের জন্য দুই প্রকারের 'টিপ' অর্থাৎ উপরোক্ত স্ট্রোকের অভ্যাস করতে হবে আমাকে, একেবারে শুরু থেকে নূতন ভাবে শাদাকালো পর্দার উপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে যে চাপ দেওয়া হয় তাকেই বলে 'টিপ'। এক 'অবিচ্ছিন্ন' টিপ্, আরেক "বিচ্ছিন্ন" টিপ্—চলতি ভাষায় বলা যায় 'নাগাড়' টিপ, আর 'ছাড়াছাড়া' টিপ্ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও শিক্ষালাভ না হলে, হারমোনিয়ম বাজনার কাজে ত্রুটি থেকে যাবে চিরকাল এবং এমনতর ত্রুটিপূর্ণ বাজনা, গান গাওয়াকেও ডিস্‌টার্ব করবেই। পক্ষান্তরে,—টিপ' দিয়ে বাজাবার এই দুটো রীতি ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করতে পারলে হারমোনিয়ম বাজনা কারো গান গাওয়াকে কখনও ডিস্টার্ব করতে পারে না, বরং এর সাহায্যে গীতসাধকদের কণ্ঠধ্বনি ক্ষেপনের কাজটি সবল এবং স্পষ্টতর হবে।

এই সমস্ত উপদেশের প্রত্যক্ষ ফলাফলও আমি পেয়ে গেলাম প্রায় সদ্য সদ্য। দিনেন্দ্রনাথের হাতে ঐ ভাঙ্গা হারমোনিয়মটারই বাজনা আমাকে এমনভাবে টানতে থাকল যে, আমি প্রত্যেকটা সার্গম অবধি ঐ বাদিত ধ্বনির সঙ্গে পরিষ্কার গাইতেও পারলাম, বলা বাহুল্য গানের কথাগুলি এরপর আপনা থেকে এসে গেল পিছন-পিছন বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে।

পৃথক্ আরেকখানা কাগজ নিয়েও পরিশেষে (অবশ্য অনেকটা সময় লেগেছিল, তবু) দিন্‌দারই আন্তরিক প্রযত্নে ধীরে ধীরে লিখলাম সুরটির সার্গম এবং তলায়-তলায় গানের কথা:

II { মা -পা পা মা | জ্ঞা রা সা সা | রা সা রা সা | সপা -া -া -া | (সা -পা পা পা |
পূ র্ বা চ   লে ব পা নে   তা ০ কা ০   ই ০ ০ ০   অ স্ তা চ

পা পা পধা পা | মা -গা মা -গা | -মা -গা মা -পা) } | মা -পা পা -া | পা -া পা -মা |
লে ব ধা রে   আ ০ সি ০   ০ ০ ০ ০   ডা ক্ দি ০   যে ০ যা র্

পা -ধা ণা ধা | ণা -া ণা র্সা | ণা -দা দা -পা | -া -া পা মা | পা -ধা ণা -া |
সা ০ ডা না   পা ই তা ব   লা ০ গি ০   ০ ০ আ জ   বা ০ জা ০

-া -া র্সা র্সা | ণা -দা দা -পা | -া -া পা মা | পা -ধা ণা -র্সা | ণা -দা দা -পা II
০ ই তা র   লা ০ গি ০   ০ ০ আ জ   বা ০ জা ই   বাঁ ০ শি ০

নিজের কাজ এবাব নিজেকে মুগ্ধ পবিতৃপ্ত কবল।

অত্র উল্লিখিত স্ববলিপিটুকু যত্ন নিয়ে অনুধাবন কবলে গীতবিলাসীবা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন, হারমোনিয়মেব সাহায্যে স্বরলিপি দেখে গান তোলাব কাজে যা কিছু সার্থকতা তাও ঐ সংশ্লিষ্ট বাদকের 'টিপ্' প্রয়োগের উপরেই নির্ভবশীল। টিপ্ প্রয়োগ যথাযথ হয় না বলেই, এই যন্ত্রের বাজনা অশিক্ষিত হাতে অবাঞ্ছিত গোলমাল সৃষ্টি কবে।

উপসংহাবে আবার বলি,—পূজনীয় গুরুদেব যে একদিন, আজ থেকে প্রায় বাহান্ন-তিপ্পান্ন বৎসর পূর্বে আমায় বলেছিলেন, হারমোনিয়ম যন্ত্র গানের সঙ্গে ব্যবহাব করার আগে তার বাজনাটি বিজ্ঞানসম্মত রীতি মেনে যেন শিখে নিই,—তা নইলে এর কুফল অবধারিত,-- সেটা বলেছিলেন আমারই ভালোর জন্যে এবং তা যে কত যুক্তিযুক্ত পরে হাতে কলমে বুঝেছিলাম সঙ্গীতগুরু দিনেন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে,—এবং অদ্যাবধি সঙ্গীত শিক্ষালাভের ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসবের সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি কবে চলেছি প্রতিনিয়ত। এটা আমার জীবনে দৈবলব্ধ আশীর্বাদ তা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এই লেখা শেষ কবলাম।

রবীন্দ্রসংগীত সংরক্ষণে দিনেন্দ্রনাথের ভূমিকা ও স্বরলিপি-বিষয়ক চিন্তা

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র

এককালে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করেছেন আজকাল রবীন্দ্রসংগীত শুনতে বসলে তাঁরা বিশেষ অসুবিধায় পড়েন, কেননা প্রায়ই তাঁরা তাঁদের শেখা রবীন্দ্রসংগীতের সুর নতুন শিল্পীদের গানে খুঁজে পান না। যাঁরা আধুনিক স্বরবিতানের স্বরলিপির নতুন সুর শেখেন তাঁরা এই সুরটাই সঠিক বলে জানেন। আবার যাঁরা অনেক আগেই সংগীতচর্চা ছেড়েছেন এবং এককালে হয় স্বরলিপির সাহায্যে না হয়ত রেকর্ড শুনে গান শিখেছেন তাঁরা তাঁদের আগের সুরে শেখা গানই বহাল রাখতে চান। বাংলা গানের একাধারে রচয়িতা ও সুরশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনও সমধর্মী রচয়িতার গানের ক্ষেত্রে এ ধরণের চাহিদা দেখা যায় না অথবা স্বরলিপির প্রতি এতখানি আনুগত্য দেখাবার প্রয়োজনও কোনও শিল্পী বোধ করেন না। কারণ, রবীন্দ্রসংগীত যে একটা বিশেষ ধরণের গান, সেটা যে কোনও প্রচলিত রাগসংগীতের আওতায় আসে না অথচ ঠিক লোকসংগীতের পর্যায়েও পড়ে না, এর প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি সুর যে একটি নির্ধারিত পথে অগ্রসর হয় এ কথা রসিক শ্রোতা মাত্রেই অবগত আছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের একটা সুস্পষ্ট ঘরাণার সৃষ্টি হয়েছে। কালোপযোগী বর্ণনাময় ভাষায় এবং কালোপযোগী সুরে তাই যখন রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হয় তখন সুর বা ভাষার বিকৃতি শুনলে সহৃদয় শ্রোতা বিচলিত বোধ করবেন বই কি। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা সকলে মেনে নিয়েছেন।

আমাদের দেশের রাগসংগীতচর্চা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সংরক্ষিত বলে প্রাচীন কালে সংগীত-লিপির সাহায্যে সুর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় নি। মতঙ্গদেব (৫ম শতাব্দী) বা শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী) কথার উপরে স্বরোল্লেখ করে এক ধরণের স্বরলিপির ইঙ্গিত দিয়ে থাকলেও সুর সংরক্ষণে সেই প্রথার বড় একটা গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তাছাড়া রাগরাগিণীর নামাঙ্কিত হলেই রাগসংগীত শিল্পীর প্রয়োগকার্য মোটামুটি এগিয়ে চলে। শিল্পীর স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার ক্ষমতা নির্ধারিত রাগরূপের মধ্যে দিয়েই সীমিত থাকে। তা সত্ত্বেও হয়ত ঘরাণায় ঘরাণায় রাগরূপ নিয়ে মতভেদ থাকার দরুণ অথবা অন্য কোনও কারণে রাগসংগীতের তত্ত্ববাগীশরা স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯শ শতাব্দীতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও তাঁর শিষ্য সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংরাজী স্টাফ নোটেশন প্রথার অনুসরণে দণ্ডমাত্রিক প্রথায় সংগীতলিপির প্রবর্তন করেন।

অসাধারণ সংগীতমগ্নতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন সংগীত রচনা আরম্ভ করলেন তখন হয়ত সুর ধরে রাখবার প্রাথমিক প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কিন্তু নিজের গান নিজে গাইবার পর যখন পরের দিনই সুরগুলো ভুলে যেতে লাগলেন তখন আরম্ভ করলেন হয় অন্যকে গানটি শেখাতে আর না হয়ত কোনও যন্ত্রীর সাহায্যে গানটিকে বাজনায় আয়ত্ত করিয়ে রাখতে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়া" থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রামাণ্য বলে ধরা যেতে পারে।—"এদিকে রবিকাকা গান লিখছেন নতুন নতুন, তাতে তখনই সুর বসাচ্ছেন, আর আমি এসরাজে সুর ধরছি। দিনুরা তখন ছোট—গানে নতুন সুর দিলে আমারই ডাক পড়ত। একদিন হয়েছে কি, একটা নতুন গান লিখেছেন। তাতে তখনই সুর দিয়েছেন—আমি যেমন সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে যাই বাজিয়ে গেছি। সুর-টুর মনে রাখতে হবে, ও সব আমার আসে না, তা ছাড়া তা খেয়ালই হয়নি তখন। পরের দিন যখন রবিকাকা আবার সেই গানের সুরটি বাজাতে বললেন আমি তো একেবারে ভুলেই বসে আছি। ভৈরবী কি, কী রাগিণী কিছুই মনে আসছে না, মহা বিপদ। আমার ভিতরে তো সুর নেই, সুর মনে রাখব কি করে। কান তৈরি হয়েছে, হাত পেকেছে, যা শুনি সঙ্গে সঙ্গে বাজনায় ধরতে পারি, এই যা। এদিকে রবিকাকাও গানের সুর বসিয়ে দিয়ে পরে ভুলে যান। অন্য কেউ পরে সুরটি মনে ধরে রাখে। রবিকাকাকে বললুম কী যেন সুরটি ছিল একটু একটু মনে আসছে। রবিকাকা বললেন, বেশ করেছ, তুমিও ভুলেছ আমিও ভুলেছি। আবার আমাকে নতুন করে খাটাবে দেখছি। তারপর বাজনাতে সুর ধরে রাখতে অভ্যাস করে নিয়েছিলুম। আর ভুলে যেতুম না। কিন্তু ঐ একটি সুর রবিকাকার আমি হারিয়েছি। কেউ আর পেলে না কোনদিন,—তিনিও পেলেন না।

আমরা, যারা রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টির প্রায় একশ বছর পরে আজ রবীন্দ্রসংগীত সংরক্ষণ নিয়ে ভাবতে বসেছি তারা নিতান্তই অভাগা তাই একজন দিকপাল চিত্রশিল্পীর হঠাৎ বলা স্বীকারোক্তির খেই ধরে সংগীত-জগতের বিপ্লব ঘটানো এক অসাধারণ সংগীত মনীষার অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ঘটনাটি জানতে পারি। এ ধরণের উদাহরণ হয়ত আরও কত অন্ধকারে রয়ে গেছে কে তার হিসাব দেবে। উপরের এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে,—১। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমদিকে সংগীত রচনা করতেন তখন সেই সব গান যথাযথ ভাবে শিখে ধরে রাখবার মতন উপযুক্ত কেউই তাঁর ধারে কাছে ছিলেন না। ২। সুর ধরে রাখবার এবং স্বরলিপিবদ্ধ করে রাখবার উপযুক্ত কেউই হাতের কাছে ছিল না। ৩। অবনীন্দ্রনাথের এসরাজ-বাদন পারদর্শিতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায় যে যাঁদের উপর নির্ভর করে গানের সুর ধরে রাখার জন্যে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সংগীতজ্ঞানের ওপর তাঁর ভরসাও ছিল না। ওই ঘরোয়াতেই অবনীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় বলেছেন, "এই সেদিন আমি রবিকাকাকে বললুম, দেখো, আমি তো তোমার গান গাইতে পারি না, তোমার সুর আমার গলায় আসে না, কিন্তু আমার সুরে যদি তোমার গান গাই তোমার তাতে আপত্তি আছে? ...রবীন্দ্রনাথ বললেন, না তা আর আপত্তি কি। তবে দেখো গানগুলো আমিই লিখেছিলুম, সুরগুলোও

দিয়েছি, সেগুলোর ওপর আমার মমতাও আছে। তা নেহাত যদি গাওই তবে তার ওপর একটু মায়াদয়া রেখেই গেও।"

অবনীন্দ্রনাথ সংগীতবেত্তা, সংগীতশিল্পী বা বাদ্যশিল্পী হিসাবে কোনোদিনই যশঃপ্রার্থী ছিলেন বলে শোনা যায়নি। সুতরাং তাঁর সরল নির্ভেজাল এই সব স্বীকারোক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের সান্নিধ্যধন্য যশঃপ্রার্থী সংগীতবেত্তাদের বক্তব্যের অনেক উর্ধ্বে স্থান দেওয়াই যথার্থ বলে মনে হয়। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীত সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি সংরক্ষণ এবং সেই সংরক্ষণকারীদের ওপর কর্তৃত্ব করবার জন্য স্বনিয়োজিত কর্তৃপক্ষের খবরদারি আপাতত যে বিষম অনর্থের সৃষ্টি করবে তাতে আর আশ্চর্য কি। সেই আলোচনায় আসা যাক।

আমরা অবনীন্দ্রনাথের কথা থেকে জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচিত গানগুলির স্বরলিপি করবার মতন উপযুক্ত কেউ রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিল না। অথচ আমরা রবীন্দ্রনাথ রচিত এমন কোনও গানের সন্ধান পাইনি যে গানের সুর হারিয়ে গেছে বলে কেউ বলেছেন।[১] আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা যেগুলি গান হিসাবে আগে জানা ছিল না বা তার স্বরলিপিও ছাপা হয়নি সেগুলির কিছু কিছু স্বরলিপি স্বরবিতানে বা সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বা হচ্ছে। এ ছাড়া বহুল প্রচারিত অনেক গানের নতুন করে সুর ও তাল থেকে অতাল কোথাও বিকল্প সুরে গান আমরা কিছু কিছু শিল্পীর কণ্ঠে শুনছি এবং কিছু বা বিকল্প সুর বা তাল হিসাবে স্বরলিপিতে প্রকাশিত করা হচ্ছে।[২] অবশ্য এই গানগুলির স্বরলিপি বিশ্বভারতীর অনুমোদিত বলেই না প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য এই সুরগুলি বা পুরোনো গানগুলি ঠাকুরবাড়ির বা রবীন্দ্রসান্নিধ্যের এমন কেউ মুখে মুখে শিখে রেখেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনের স্নাতকদের মুখে মুখেই সুরগুলির প্রচলন ছিল এবং পরে সময় সুবিধে মত ছাপা হল এমন হয়ে থাকবে। সন্দেহজনিত সুযোগ হিসাবে (Benifit of doubt) এই যুক্তিতেই বোধকরি আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরলিপিকারের স্বরলিপি বদলে দিয়ে তারই নামে সেই বদল করা সুর চালানো ঠিক এই যুক্তির আওতায় আসে না।

আমরা অনেকের বক্তব্য থেকে জেনেছি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেও জেনেছি যে

১ শুনেছি যে "আজি বরষার রূপ হেরি" এই গীতাঞ্জলির কবিতাটি নাকি একটি গান যার সুর পাওয়া যায়নি। গীতাঞ্জলিতে সব শুদ্ধ ১৫৭টি কবিতা আছে এবং তার মধ্যে আমরা অর্ধেক কবিতার কিছু বেশি সংখ্যক কবিতাকে গান হিসাবে পেয়েছি। বাকি কবিতা হিসাবেই আপাতত পরিগণিত হচ্ছে।

২ শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর যিনি দিনুবাবুর কাছে ছোট বয়সকাল থেকেই রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন তাঁর কাছে এই অনুযোগ শুনেছি যে অনেক গানের আজকাল বিকল্প সুর গাওয়া হচ্ছে, যে-গুলির সুর রচনার সময় অন্য সুর প্রচলিত ছিল। উদাহরণ হিসাবে একটি গান,—"আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে" গানটির অতালে বিকল্প সুরটির উল্লেখ করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিয়ানোবাদন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার সহায়ক হয়েছে।[৩] এ ছাড়া অনেক সময় হঠাৎ কখনও বা স্নান করবার সময় নতুন গানের নতুন সুর তাঁর মনে জেগে উঠেছে। কখন বা আপনমনে কোনও রাগ বা রাগিনী ভাঁজতে ভাঁজতে মনের মধ্যেই নূতন সুরের পরিকল্পনা করেছেন। সেই সুর ধরে রাখবার জন্যে যখন তখন দিনেন্দ্রনাথের ডাক পড়ত। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সুরগুলো বাজনায় ধরে রাখা বা গলায় শিখে নেওয়া এক জিনিস আর সংগীতলিপির সাহায্যে সেই সুরকে চিরস্থায়ী করে রাখা অন্য জিনিস। সুতরাং সংগীতলিপি প্রস্তুত করার মনন বা পারদর্শিতার কথা তখন অবশ্যই ভাবা হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'তে এক জায়গায় বলেছেন যে জোড়াসাঁকোতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও পাথুরেঘাটায় সৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমোদকুমার এক সময় স্বরলিপি নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছিলেন যদিও প্রমোদকুমাব উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যেই তাঁব চিন্তা নিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ[৪] সুর ধরে রাখার জন্যে সুর-সুদর্শন চক্র মাথা ঘামিয়ে বের করেছিলেন এবং ছাপিয়েও ছিলেন যার মধ্যে সা-রে-গা-মা ইত্যাদি সব সুব ধরা থাকত। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি এত ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হত না। মুখ্যত অল্পবিস্তর সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হত। পরে কতকগুলি স্বরলিপির বই প্রকাশিত হয়েছিল। দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি ছাড়া উত্তর ভারতেও সেই সময় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞরা নিজ নিজ প্রথায় স্বরলিপি প্রবর্তন করেছিলেন। যাই হোক, বোধকরি সরলতার খাতিরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আকার মাত্রিক স্বরলিপির কিছু কিছু সংশোধন করে নূতন স্বরলিপির প্রবর্তন করেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় "সাধনা" মাসিক পত্রের প্রথমবর্ষে প্রথমভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "আকার মাত্রিক স্বরলিপির নূতন পদ্ধতি" ছাপা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরে দিনেন্দ্রনাথই একাদিক্রমে এই পদ্ধতিতে স্বরলিপি করতেন এবং স্বরলিপি প্রবর্তনে তাঁরই সুযোগ হয়েছিল সব থেকে বেশি।

রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে "আমার সকল গানের ভাণ্ডারী" বলে জনসমক্ষে পরিচিতি দিয়েছেন। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর, যিনি ১৯২০ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং রমা কর, শ্রীমতী সাবিত্রী কৃষ্ণন, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীসমরেশ সিংহ, শ্রীপ্রসুন সেন প্রমুখ খ্যাতনামা গায়ক গায়িকাদের সঙ্গে একযোগে দিনুবাবুর কাছে গান শিখেছিলেন, তাঁর কাছে শুনেছি যে একসময়

৩ "এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর রচনায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহ তাঁর অঙ্গুলি-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি, অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"—জীবনস্মৃতি

৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় স্বরলিপির ব্যাখ্যা সহ পাঁচখানি ব্রহ্মসংগীত ১৮৬৯ খৃঃ "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা স্বরলিপিব প্রবর্তন করেন। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর বলেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বা'লা আকারমাত্রিক স্বরলিপিব প্রবর্তন করেন।

দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিলেন যখন তিনি থাকতেন "দেহলী" নামক বাড়ির একতলায় এবং রবীন্দ্রনাথ থাকতেন সেই বাড়ির উপর তলায়। দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গানগুলো এসরাজে তুলে নিতেন এবং গান শেখাতেন প্রায় সকল উৎসবাদির আয়োজনের তাগিদে। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গানে প্রায়ই শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়তন মুখরিত থাকত। স্বরলিপি করতেন খালি গলায় হাতে তাল দিয়ে। গান শেখানোর সময় স্বরলিপি সামনে থাকত না এবং অনেক সময় স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের উপস্থিতিতেই গান শেখাতেন। সুতরাং দিনেন্দ্রনাথের সংগীত শেখানো ও স্বরলিপি প্রবর্তন ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের সংগীতরচনার সমসাময়িক এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত সুতরাং নির্ভুল হিসাবে মেনে নেওয়াই সঙ্গত।

অথচ এমন একটা সময় এল যখন প্রাচীন স্ববলিপির, বিশেষ করে দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপিব অনেক গানের সুর নূতন করে বা অদল বদল করে প্রকাশিত হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেখা গেল দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপির প্রচুর পরিবর্তন। যার কয়েকটি উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে,—

১ স্বরবিতানের প্রথম খণ্ডেব প্রথম সংস্কবণে ১৩৪২ সালে দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানখানি প্রকাশিত হয়। ১৩৫৪ সালের সংস্করণে সেই সুরের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। ১৩৫৬ সালেব সংস্করণে দেখা গেল সেই বদলানো সুরই দিনেন্দ্রনাথের নামে চলে আসছে।

২ 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে' গানখানির স্বরলিপি স্বরবিতান ২য় খণ্ডে ১৩৪৩ সালে দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি বলেই প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের প্রকাশনায় সুর অবিকৃত রেখে ১৩৫৯ সালের প্রকাশনায় সেই সুর বদল করা হয়।

৩ ওই একই খণ্ডের ১৩৪৩ সালের প্রকাশনায় "বন্ধু রহো রহো সাথে" গানটির সুর বদল করে ১৩৫৯ সালে দিনেন্দ্রনাথের নাম দিয়ে ছাপানো হয়।

৪ 'কোথা যে উধাও হল' গানটির ১৩৪৩ সালের স্বরলিপি ১৩৫৫ সালের প্রকাশনায় পরিবর্তিত করে ১৩৫৯ সালের প্রকাশনায় সেই পুরাতন সুরেই ফিরে যাওয়া হয়।

৫ 'আমারে ডাক দিল কে' নবগীতিকা ১৩২৯ সালে কৃত স্বরলিপি। ১৩৩৭ সালের প্রকাশনায় অবিকৃত থাকবার পর ১৩৫৭ সালের প্রকাশনায় পরিবর্তিত হয়েছে।

৬ 'অন্ধজনে দেহ আলো' বৈতালিক অন্তর্ভুক্ত স্বরলিপি। ১৩৬২ সালে সেই স্বরলিপির আমূল পরিবর্তন করে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ১৩২৫-এর বৈতালিকের কয়েকটি গানের সুর বদলের নিদর্শন সংক্ষেপে দেওয়া গেল,—

৭ তব অমল পরশ রস — বৈতালিক-১৩২৫
স্বরবিতান-১৩৫৯

৮	চির বন্ধু চির নির্ভর	বৈতালিক-১৩২৫ স্বরবিতান-১৩৫৯
৯	নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে	বৈতালিক-১৩২৫ স্বরবিতান-১৩৫৯
১০	তোমারি নামে নয়ন মেলিনু	বৈতালিক-১৩২৫ স্বরবিতান-১৩৫৮
১১	হেরি তব বিমল মুখভাতি	বৈতালিক-১৩২৫ স্বরবিতান-১৩৫৯

দিনেন্দ্রনাথ ছাড়াও প্রথম দিকে রমা কর, কাঙ্গালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী সাহানা দেবী প্রমুখ আরও অনেকের স্বরলিপির পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এই সমস্ত পরিবর্তিত স্বরলিপির উদাহরণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের বা তাত্ত্বিকদের কাছে অগুনতি রয়েছে।[৫] বিশেষ করে যে সমস্ত প্রবীণ শিল্পীকে গান করতে হয় রেডিওতে টিভিতে বা গ্রামফোন রেকর্ডে তাদের শেখা পুরোনো গানগুলি অনেক সময় আবার নতুন স্বরলিপির নির্দেশ মত নতুন করে শিখতে হয়। এমনকি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের ক্ষেত্রেও রেহাই নেই। কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছ থেকে কোনও লিখিত বিবৃতি এ সম্বন্ধে আশা করেন না। কারণ একথা সকলেই ভাল করে জানেন যে অন্যথায় শিল্পীদের রুজি রোজগার ব্যাহত হবার আশঙ্কা আছে। আর জনসাধারণেব প্রতিবাদে তাঁরা কর্ণপাতও করেন না।

১৩৬০ সালের সমকালীন পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় উদাহরণ সহযোগে স্বরলিপি পরিবর্তনের অভিযোগ আনা হয়। পরে ১৩৬২ সালের এই পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "রবীন্দ্র-সংগীতে সুরদলন" শীর্ষক প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ ভাবে বিশ্বভারতী সংগীত বিভাগের বিরুদ্ধে উদাহরণ সহযোগে অনুযোগ তুলে কর্তৃপক্ষের অনধিকার চর্চার অভিযোগ আনেন। তাঁর লেখনী নিঃসৃত ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত বিশেষণগুলি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন,—"এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে।,"··· "এঁদের প্রত্যেকেই (বিশ্বভারতীর সংগীতবিভাগের) নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রমাণ করবার জন্যে ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্য ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যে লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাত যদি তাঁদের আত্মপ্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের

৫ প্রসঙ্গত প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও গীতবিতান সংগীতায়নের শিক্ষক শ্রীনীহারবিন্দু সেনের "গীতবিতান" পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর জয়ন্তী সংখ্যায় "রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে।

গানকে এমন করে বিকৃত না করত। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে তাঁদের সংগীত বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্বনাশী খেলা যে কি করে বরদাস্ত করেন, কেন বরদাস্ত করেন তা আমাদের ধারণার বাইরে।"…"এত অগুন্‌তি গান এদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তার তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বিশ্বভারতী সংগীতবিভাগের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরগুলির বিশেষত্ব, তাদের অপূর্বত্ব, তাদের অনন্যসাধারণ মৌলিকতা ঘুচিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন।"…"স্রষ্টার সৃষ্টির উপর হাত চালাবার অধিকার কারও নেই।"

সুর বিকৃতির প্রচেষ্টার মধ্যে খামখেয়ালীপনাও যেমনি প্রকট হয়ে ওঠে তেমনি চাপা উদ্দেশ্যেরও আভাস পাওয়া যায়। যেমন দিনুবাবুর স্বরলিপির উপর হস্তক্ষেপ। যেমন হিন্দীগানের ছায়ায় রচিত সুরগুলির রাগ বিচ্যুতির (?) সংস্কৃতি সাধন। 'চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ', 'মোরে বারে বারে ফিরালে', 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী' প্রভৃতি ধরণের গানগুলিতে হিন্দীগানের মত যথাযথ সুর রাখবার প্রয়োজনে প্রচলিত পুরাতন স্বরলিপি বদল করা হয়েছে। এই সকল অনুযোগের উত্তর কর্তৃপক্ষ কোনোদিনই দেননি হয়ত দিতেও চান না। কিন্তু সুরগুলির নূতন স্বরলিপি করবার সময় অন্তত একটা বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ তো দেওয়া চলত। এই কৈফিয়ত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, "সাময়িক পত্রিকা প্রকাশকালে, বা স্বরলিপি গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণে অথবা লোক-ব্যবহারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্তি বা চ্যুতি ঘটিয়াছে তাহার সংস্কার।" পূর্বতন স্বরলিপিকারের মতামত না নিয়ে বা লোকব্যবহারে বিচ্যুতির ঘটনাকে এত সহজে কয়েকজনের মতামত সম্বল করে সুরসংস্কারের (?) মূল্য কি? ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় সংঘটিত হলে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতামত গ্রহণ করতে হত। আবার সৌম্যেন্দ্রনাথের উক্তি এ সম্বন্ধে স্মরণ করা যেতে পারে।

'গ্রাম ছাড়া এই রাঙামাটির পথ' গানটির স্বরলিপি ১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত'র স্বরলিপিতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানটির সুর বহু পরিবর্তন করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য দ্বারা কৃত। দিনেন্দ্রনাথ আজ নেই তাই তাঁর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার যথার্থতা বিচার করবার উপায় নেই। কিন্তু যে অন্যের কথা বলা হয়েছে সেই "অন্যটি" কে এবং তাঁর কি অধিকার আছে সুর বদল করবার সেটা জানতে ইচ্ছা করে। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ জীবিতকালে শ্রীমতী কনক দাস এই গানটির যে রেকর্ড করেছেন সেটিকে প্রামান্য বলেই ধরা যেতে পারে। স্বরলিপির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই।

অনেকে বলেন যে স্বরলিপি নিয়ে যে বিবাদ দেখা দিয়েছে তার জন্য রবীন্দ্রনাথ অংশত স্বয়ং দায়ী। তার কারণ বিভিন্ন সময় রবীন্দ্রনাথ একই গানে বিভিন্ন সুর দিয়েছেন। স্বরলিপিতেও তাই একই গানের বিভিন্ন সুর দেখা দিয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ কোনও গান রচনা করলে তৎক্ষণাৎ কাউকে সেই গানটি শিখিয়ে দিতেন, পাছে ভুলে যান। রবীন্দ্রনাথের গান মোটামুটি ভাবে দুভাগে ভাগ করা যায় কারও মতে বা তিন ভাগে। প্রথমত বিশুদ্ধ রাগসংগীতের ব্যাকরণ

অনুযায়ী গান, যেগুলো হিন্দী গানের হুবহু সুরে, সেগুলোর সুর ভুলে যাবার নয়।[৬] দ্বিতীয় প্রকার গানগুলোর অধিকাংশই রাগসংগীতের নিয়ম মেনে চলেনি এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে বিপথগামী করা হয়েছে।[৭] বিকল্প মতে তৃতীয় শ্রেণীর গানগুলিকে "ভাঙ্গা গান" আখ্যা দেওয়া হয়েছে যে গানগুলি হিন্দী গানকে হুবহু নকল করেনি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে সব গানগুলির বিকল্প সুর দিয়েছেন এবং তাঁর জীবিতকালেই সেই স্বরলিপি ছাপা হয়েছে সেই উদাহরণ বাদ দিলে এবং প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলি বাদ দিলে বাকি গানের সুরগুলি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে ভুলে যাওয়া সম্ভব। নূতন করে এই সব গানের সুর রচনা করতে গেলে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে পুবাতন সুরের অদল বদল হতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দু একটি পর্দার অদল বদল করা যে কতটা সংগত সেটা ভাববার কথা। এ ধবণের সুবের অদল বদল করে কোনও গানেব সুরকে কোনও পরিচিত রাগের সামিল করে দেওয়াকে অন্তত ববীন্দ্রসংগীতকে শুদ্ধ করে দেবার কৃতিত্ব বলা যায় না বরং এটাকে বিশেষ রসভাবাদি পরিবেশনেব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সুরেব বিকৃতি বলে গণ্য করা যায়।[৮] 'নৃত্যের তালে তালে' গানটির কথাই ধরা যাক। বিশেষ করে এই গানটির উদাহরণ দেওয়ার তাৎপর্য আছে, যেহেতু এই গানটি গীতবিতান শিক্ষায়তনে দ্বিজেন চৌধুবী তখনকার চলতি স্বরলিপি অনুসারেই শিক্ষা দেন। ১৩৫০ সালে আশুতোষ কলেজ হলে সমবেতকণ্ঠে গীতবিতানের ছাত্রছাত্রীরা এই গান করেন। ভাষ্যকার ও এসরাজবাদনকারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ক্ষিতিমোহন সেন ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার। কনক দাস ও দেবব্রত বিশ্বাস এই গানে কণ্ঠ যোজনা করেছিলেন। সেই গানের 'ওগো সন্ন্যাসী ওগো সুন্দর ওগো শঙ্কর হে ভয়ংকর' এই অংশে আগের স্ববলিপিতে কোমল গান্ধার ব্যবহার করা হয়েছিল প্রবল ভাবে। গীতবিতান শিক্ষায়তনেও এইভাবেই গানটি শেখানো হয়েছিল এবং গানও ঐ সুবে করা হয়েছিল। স্বরবিতান ২য় খণ্ড ১৩৫৫ সালে প্রকাশ করা হয় এবং সেই স্বরলিপি গ্রন্থের শুদ্ধিপত্রে পুবাতন দিনেন্দ্রনাথকৃত স্বরলিপি পরিবর্তন করে কোমল গান্ধারের বদলে শুদ্ধ গান্ধার লাগিয়ে ছাপানো হয় সেই দিনেন্দ্রনাথেরই নামে অথচ দিনেন্দ্রনাথ তার প্রায় একযুগ আগে ইহধাম

৬ জয় তব বিচিত্র আনন্দ, বিপুল তরঙ্গ রে, মহারাজ একি সাজে ইত্যাদি গানগুলি

৭ 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' গানখানিব স্ববলিপিতে কোমল বেখাব ও কড়ি মধ্যম পর্দাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং শিক্ষায়তনগুলিতে এই সুরেই গান শেখানো হয়েছে যদিও এইচ এম ভি কম্পানীর এন্ ৮২৭১১ নং রেকর্ডে গানখানি গাওয়া হয়েছে শুদ্ধ মালকোষে স্বরলিপির কোমল রেখাব ও কড়ি মাধ্যম বাদ দিয়ে। 'আমার নিশীথ বাতের বাদল ধারা' গানটির কোমল ধৈবত পর্দা লক্ষ্যণীয়।

'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই' গানখানিতে আরোহণে খাড়া ভাবে রেখাবেব ব্যবহার, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানটিতে কোমল রেখাবের দৃঢ় ব্যবহার। এই গানগুলির মতন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে

৮ 'তাঁহারে আরতি করে'—বৈতালিক,স্বরবিতান ২২। 'মোরে বারে বারে ফিরালে'—ব্রহ্মসঙ্গীত/ স্বরবিতান২৪।

পরিত্যাগ করেছেন।[১] এই গানের চারটি তুকের শেষ তুকটিতে কোমল গান্ধার লাগানো নটরাজের মধুর অথচ ভয়ঙ্কর মূর্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা সুর, কার ইচ্ছায় জানি না, পরিবর্তন করে অন্যান্য তুকগুলির সুরের সামিল করে দেওয়া হল। আমবা বিশ্বস্ত সূত্রে জানি যে কোনও প্রখ্যাতা শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্তা শিল্পীকে সেই পুরাতন সুরে বেকর্ড করতে দেওয়া হয়নি। তাঁকে নূতন করে সেই নূতন সুরে রেকর্ড করিয়ে তবে বাজারে ছাড়া হয়।

শুধু সুব বদলই নয়। ভাষার বা উচ্চারণেরও বদল করা হয়েছে। 'সে আমার গোপন কথা' গানটিতে প্রথমে 'প্রাণ আমাব বাঁশি শোনে,' এই রকম ছাপা হয়েছিল। পরে করা হল 'প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে'। পরের সংস্করণে আবার পুরোনো 'প্রাণ আমার বাঁশি' তে ফিরে যাওয়া হল।

'যৌবনসরসীনীরে' গানটিব এখনকার স্বরলিপিতে 'টলমল' কথাটির শেষ অক্ষরে হসন্ত যোগ করে 'টল্‌মল্‌' করা হয়েছে। গীতবিতানে আছে 'টলোমল' (হসন্ত নেই) যদিও 'কোন্‌' কথাটায় হসন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পঙ্কজবাবুর কণ্ঠে বা তাঁর গাওয়া রেকর্ডখানিতে হসন্তবর্জিত 'টলমল' কথাটির সবেদন উচ্চাবণ সূক্ষ্ম শ্রুতির ব্যবহারে সুরের ব্যঞ্জনা শ্রোতার প্রাণে রোমাঞ্চ জাগায় একথা মানতেই হবে। শেষ শব্দে হসন্ত না থাকায় সেখানে শ্রুতির ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ছন্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে বলছেন "অন্ত্যবর্ণের শেষে হসন্ত থাকলে ছন্দের খাতিরে কাকে টানা যাবে।" এক্ষেত্রেও বলি যে অন্ত্যবর্ণে হসন্ত থাকলে সুর ও শ্রুতির ব্যবহার কি করে দেখানো যাবে? ভাষার বদল করা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি যখন লিখেছিলাম তখন মারাঠা বানান করিনি। মারাঠিরাও প্রথমবর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল মরাঠা। তারপর যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করেছেন।"

এতগুলো কথা বলতে হল এই কথা প্রতিপন্ন করতে যে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠা করে তার রূপ অক্ষুণ্ণ রাখতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছিল তার কিয়দংশও প্রতিপালিত হল না। আমরা আশা করেছিলুম যে বিশ্বভারতী সংগীতবিভাগ পূর্ব-প্রকাশিত স্বরলিপিগুলি, যা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলিকে, অক্ষুণ্ণ রাখবে। অপ্রকাশিত অথচ পুরাতন সুরক্ষিত স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হবে এবং সর্বশেষে সুর সংরক্ষণের সঠিক রীতি প্রবর্তন করার দায়িত্বও এই মিউজিক বোর্ডকেই নিতে হবে যাতে স্বরলিপি অনুসরণ করে শিল্পীরা নির্ভুল সুরে যথাযথ ভাবে সংগীত পরিবেশন করতে পারেন।

১ র্সা -র্মা | মজ্জ্ঁা -া জ্জ্ঁা | -া -া | জ্জ্ঁা -া জ্জ্ঁা | জ্জ্ঁা র্মা | র্মা জ্জ্ঁা জ্জ্ঁ
স ন্ ন্যা • সী • • ও • গো সু ন্ দ • র

এই পুরাতন স্বরলিপি বদল করে নূতন সুর,—

র্সা -র্গা | র্গা -া র্গা | -া -া | র্গা -া র্ম | র্গার্মা -র্পা | র্মা -র্গা রর্সা
স ন্ ন্যা • সী • • ও • গো সু ন্ দ • র

সুর সংরক্ষণের উপায় হিসাবে প্রচলিত পন্থায় স্বরলিপির উপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা ছিল না সে কথা তাঁর অনেক উক্তি থেকে জানা যায়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"আজকালকার দিনে ছাপাখানা ও স্বরলিপি প্রভৃতির উপায়ে নিজের রচনায় রচয়িতার দায়িত্ব পাকা করে রাখা সম্ভব। তাই রচনাবিভাগে সরকারী যথেচ্ছাচার নিবারণ করা সহজ এবং করা উচিত।" এই সরকারী যথেচ্ছাচার নিবারণকল্পে দিনুবাবু ও অন্যান্য স্বরলিপিকারদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজ দায়িত্ব পাকা করে রাখতে চেয়েছিলেন। সঠিক স্বরলিপি উদ্ভাবন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধে বলেছেন, "আমাদের দেশে ভালো স্বরলিপি ছিল না। রাগরাগিণীর নাম অসম্পূর্ণরূপে স্বরলিপির কার্য সাধন করিত। কিন্তু এখনও সেই অসম্পূর্ণ অসুবিধা ভোগ করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। ইংরাজী স্বরলিপি গ্রহণ করিতে দোষ নাই—তা না হয় তো নূতন স্বরলিপি নির্মাণ করা হউক।" পরে বিলাতে থাকাকালীন পত্রযোগে অনাদি দস্তিদারকে বিলাতী ষ্টাফ নোটেশন শিক্ষার তাগিদ দেন। বোধকরি আকারমাত্রিক স্বরলিপি বা অন্য প্রচলিত স্বরলিপিগুলি যথেষ্ট পরিণত নয় সে কথা তিনি বুঝেছিলেন।

আমরা রাগসংগীতের সংরক্ষণে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির ব্যবহার নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এই প্রথার দুর্বলতাগুলি রাগসংগীত প্রয়োগের নীতি অনুযায়ী ঢাকা পড়ে যায়। স্বরলিপি-কার প্রথমেই রাগের নাম ব্যক্ত করে থাকেন এবং প্রয়োগশিল্পীরাও পরিবেশনের আগে রাগের নাম ঘোষণা করে থাকেন। পরে তানপুরা তবলা বেহালা বা সারেঙ্গী শিল্পীর কণ্ঠের প্রসার অনুযায়ী বেঁধে নেওয়া হয়। সুতরাং শ্রোতাদের কাছে সেই স্কেলের ষড়জ, মধ্যম, পঞ্চম স্বরগুলি প্রতীয়মান হবার ফলে সংগীত সঠিকভাবে অনুধাবন করবার অসুবিধা হয় না। স্বরলিপিকার রাগের নাম ও সুরের পর্দাগুলি দেখানোর ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে স্কেল নির্ধারণ বা শিক্ষার কোনও গোলযোগ হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অসম্পূর্ণ' হলেও এই স্বরলিপিতে রাগসংগীতের সংরক্ষণ ও প্রচারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি অপেক্ষাকৃত সহজ বলেই বোধকরি স্বরলিপিকারেরা এই স্বরলিপি রবীন্দ্রসংগীত সংরক্ষণে ব্যবহার করেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই,—বোধকবি একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর সকল স্বরলিপিকারই স্বকণ্ঠে বা এসরাজে সুর তুলে নিয়ে তারপর স্বরলিপি করেছেন। যাঁরা ষ্টাফ নোটেশন লিখন ও পঠন পদ্ধতি অবগত আছেন বা যাঁরা বৈজ্ঞানিক প্রথায় স্বরক্ষেপন পদ্ধতি শিক্ষা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন যে গান গাইবার আগে রবীন্দ্রনাথ স্বরলিপিকারকে সেই গানের স্কেলটি বলে দিতেন কিনা। কিংবা স্বরলিপিকার তাঁর কাছ থেকে সেই রচিত সুরের রাগের নাম বা ষড়জ্‌ স্থানটির পর্দার নাম অথবা কোন পর্দায় প্রথম স্বরটি উচ্চারিত হবে সেই পর্দাটি জেনে নিতেন কিনা। পর্দার নাম,—যেমন ন্যাচারাল "সি" বা "বি" ফ্ল্যাট। স্কেলের নাম—যেমন "সি মেজর" বা "বি" মাইনর। রাগের নাম যেমন, "ভৈরবী" বা "ইমন"। এগুলি আগেভাগে জানা না থাকলে সঠিক স্বরলিপি করা সম্ভব নয়। আমরা জানি যে অনেক স্বরলিপিতে রাগ নির্দেশ দেওয়া থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে রাগ-চিহ্নিত করা পছন্দ করতেন না। সুতরাং

স্বরলিপিকারের প্রথম স্বরস্থাপনে যে অসুবিধা হয়েছিল সে কথা আমরা বুঝতে পারি। এসরাজে গানের সুর ঠিক ভাবে ধরা যায় সে কথা ঠিক কিন্তু স্বরলিপির পর্দা কোন স্কেলে বসাবেন? আবার যিনি খালি গলায় গান তুলে নিয়ে পিয়ানো বা হারমোনিয়মের সাহায্যে গান করবেন বা স্বরলিপি করবেন তাঁর প্রচেষ্টা আবও ভ্রান্তিমূলক হতে পারে। একবার সরগম সেধে নিয়ে গান করলে সেই ভ্রান্তি দূর করা সম্ভব কিন্তু গানটির আরম্ভের পর্দা জানা না থাকলে সেখানেও ভ্রান্তি। দুএকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক গায়কের গলার প্রসার B flat পর্দাকে ষড়্জ করার উপযোগী। শিল্পী পর পর দুখানি গান করবেন, গান দুটির প্রথম গান 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' ওই ষড়জ্ পর্দাতেই শুরু করা হল এবং শেষ হবার পর ঠিক ওই পর্দা থেকেই 'হিমের রাতে ওই গগনের' গানটি গাওয়া হল। দেখা যাবে যে দুটি গানের সুর হুবহু এক। গানের স্বরলিপির হিসাবে প্রথম গানটি কোমল ধৈবত পর্দায় আরম্ভ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় গানটি ষড়জ্ পর্দায় আরম্ভ করা হয়েছে এবং তার ফলে গান দুটির পৃথক সুরগুলি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, যদি যথার্থ স্বরলিপি হয়ে থাকে। এ ধরণের অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গানের মাঝখানেই একটি পর্দার উপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে খরজ পরিবর্তনপদ্ধতিতে হঠাৎ নূতন পর্দায় সুরের বিস্তার করেছেন,—যেমন 'আমাব নিশীথ রাতের' গানটিতে 'এসো গো গোপনে আমার স্বপনলোকে' কলিতে কোমল ধৈবত লাগিয়েছেন ঐ 'স্বপনলোকে' কথাটির উপর। সুতরাং স্বরলিপিকার কী ভাবে কোন পর্দা বেছে নিয়ে গানের স্বরলিপি করবেন সেটাও যেমন ভাববার কথা আবার শিল্পীর পক্ষেও সেই স্বরলিপির আরম্ভ-স্বরটি জানার কথা। শিল্পীর যদি জানা থাকে যে প্রথম গানটি ভৈরবী ঠাটে এবং দ্বিতীয় গানটি ইমন ঠাটে তাহলে অবশ্য গান করতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। এই ভুল ইংরাজী ষ্টাফ নোটেশন প্রথায় হওয়া সম্ভব নয় অন্তত স্বরলিপিকার সুরস্রষ্টা ও শিল্পীর মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ব্যবধান ঘুচে যাবে। সেই কথাতেই আসা যাক।

পশ্চিমী শব্দবিজ্ঞানীরা (হেল্‌ম্‌হোলজ, টিণ্ডাল প্রমুখ) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে কোনও সরল স্থিতিস্থাপক বস্তুর (সিম্পল ইল্যাষ্টিক বডি) আঘাতজনিত কম্পন শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই কম্পনের কম বেশির তারতম্যে স্বরের তীব্রতা (ইংরাজি—পীচ্) বাড়ে বা কমে। এই ধরণের এক সেকেণ্ডে ২৫৬ বার কম্পন থেকে যে স্বরের সৃষ্টি হয় সেই স্বরকে পিয়ানোর মাঝামাঝি পর্দায় স্থাপন করে তার নাম দিয়েছেন "মিড্‌ল সি"[১০] এবং পর পর প্রথম "সি" থেকে আটটি স্বর যথাক্রমে, সি, ডি, ই, এফ্, জি, এ, বি, সি নাম দিয়ে কম্পন-সংখ্যার ভিত্তিতে যথাক্রমে,—২৫৬, ২৬৮, ৩২০, ৩৪১⅓, ৩৮৪, ৪২৬⅔, ৪৮০, ৫১২ কম্পন-সংখ্যায় উদ্ভাবিত স্বর-স্থান বেঁধে দিয়েছেন। ষ্টাফ নোটেশনের বৈশিষ্ট্য হল এই বাঁধা পর্দার ভিত্তিতে স্বরলিপি করা এবং সেই একই ভিত্তিতে গান করা

১০ মিড্‌ল্ সি কম্পন-সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত। পাশ্চাত্যসংগীত-পণ্ডিতদের মতে ২৪০। ফিজ্ হারমনিক স্কেলে ২৬১.৫

বা যন্ত্র বাজানো। অর্থাৎ ন্যাচারাল "সি" প্রথম পর্দা হিসাবে স্বরলিপি করা থাকলে সেই পর্দা থেকেই গান বা বাজনা আরম্ভ করতে হবে। অন্তত বিলাতী অর্কেষ্ট্রা বাজনায় এই নিয়ম রক্ষা করা হয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে গায়কের কণ্ঠের প্রসার মত যে কোনও পর্দাকে সা করে হারমোনিয়াম বা পিয়ানোর সাহায্যে গান করলে কম্পন-সংখ্যার ভিত্তিতে স্থাপিত পর্দার ভগ্নাংশজনিত সূক্ষ্ম স্বরবিচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা আছে।

এই সমস্ত কারণগুলো ভেবেই বোধকরি রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু-না-কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না।" সুতরাং স্বরবিতানের স্বরলিপিগুলি নিয়েও কিছুটা মাথা ঘামানোর দরকার। সঠিক স্বরলিপি ও গায়নপদ্ধতির কিছু কিছু নির্দেশ এই স্বরলিপির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক গানগুলিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধের শেষে বলেছেন, "উপসংহারে সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে আর কেনই বা তাহা করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসংবাদী, তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ, সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসংবাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলি অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক।··· এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবেনা যেদিন সকলে বলিবেন 'বাঃ কি সুন্দর ভাব!'" আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গান রচনার মধ্যেই এই 'আবিষ্কারের' চাবিকাঠিটি লুকানো আছে এবং তা খুঁজে দেখা দরকার।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে গবেষণা করতে হলে আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন হবে সঠিক স্বরলিপি। আমরা যারা প্রায় চল্লিশ বা তারও আগে থেকে রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপিচর্চা করেছি তাদের কানে সাম্প্রতিক রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীদের গান প্রায়শই ভুল বলে মনে হয়। আবার নতুন স্বরলিপি আমাদের পরিচিত সুরগুলিকে ভুল প্রতিপন্ন করে। সুতরাং প্রাচীন স্বরলিপিগুলিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যে সমস্ত গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানো বাজনার সুরে রচিত ও স্বরলিপিকৃত হয়েছে সেগুলি বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ভুল। তেমনি নূতন গান রচনার সময় এসরাজে যে সুর তুলে স্বরলিপি করা হয়েছে সেই প্রথম স্বরলিপি যথাযথ হয়েছে। শুধু আরম্ভ পর্দার স্বরস্থানগুলি একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য তৎকালীন সংগীত ও বাদ্যে

ব্যুৎপন্ন রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখনও অনেকে জীবিত আছেন যাঁরা দিনেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে সংগীতচর্চা করেছিলেন। তাঁদের সকলের মতামত বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির মধ্যে লয়নির্ধারণ চিহ্ন দেওয়া যে কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা বোঝা গেল না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে বলেছেন, "দুঃখের গান ঢিমা তালে ও আনন্দের গান দ্রুত তালে" গাওয়া দরকার। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সংগীতের ভাব প্রকাশ করবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রসংগীতে সাধারণত দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয় ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত বর্ণনা-মূলক ঋতুসংগীত বা অন্য ধরণের আনুষ্ঠানিক গানগুলি দ্রুত লয়ে গাওয়া যেতে পারে। মধ্য ও বিলম্বিত লয় সাধারণত ভাবপ্রবণ গানে প্রযোজ্য। এবং ভাবের গভীরতার তারতম্যে এই দুই লয়ের সুচিন্তিত ব্যবহার হওয়া উচিত। সুতরাং বিশ্বভারতী সংগীতভবন কর্তৃপক্ষের লয়নির্দেশক চিহ্নের পুনঃপ্রবর্তনের কথা চিন্তা করা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত "আকারমাত্রিক স্বরলিপির নূতন পদ্ধতি"-তে লয়চিহ্নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। "স্বরলিপি গীতিমালায়" এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছিল। বিশ্বভাবতী কর্তৃপক্ষ "রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা" প্রকাশের সময় ১৩৬৮ সালে প্রকাশিত "গীতিচর্চা" সংকলনে এই চিহ্নের ব্যবহার কবে ভূমিকায় লিখেছিলেন, "প্রত্যেক গানের লয়নির্দেশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ও স্বরলিপি গীতিমালায় ব্যবহৃত প্রণালী অনুযায়ী—উহার ব্যাখ্যা আকারমাত্রিক স্বরলিপির ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইল।" অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে পরবর্তী কালে স্বরলিপির সংকলনের সময় বা স্বববিতানের নূতন মুদ্রণের সময় কর্তৃপক্ষ লয়-নির্দেশের এই নূতন চিহ্ন সন্নিবেশিত করলেন না।

এছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের ভাবপ্রকাশের জন্যে স্বরগুলির কোথাও কোথাও বা স্বরের নির্ধারিত শ্রুতিস্থান পরিবর্তিত হয়েছে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে গাওয়া রেকর্ড শুনে বা সাহানা দেবী বা মালতী ঘোষালের গান শুনে বা শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের এসরাজ শুনে এই রকম মনে হয়। সূক্ষ্ম শ্রুতির ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কত ভেবেছেন তাঁর নিম্নলিখিত বক্তব্যের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়,—"বিলাতী গানের সঙ্গে এই দেশী গানের ছাঁদের তফাতটা কোন্‌খানে ? প্রধান তফাত সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারই যোগে একসুর কেবল যে আর এক সুরের পাশাপাশি থাকে তাই নয় ইহাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগরাগিণী যদি বা টেঁকে তার ছাঁদটা বদল হইয়া যায়।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে যেখানে হঠাৎ লাগানো আগন্তুক স্বর গানের সুরে ও ভাবে বিহ্বলতার সৃষ্টি করে .সেই সব আগন্তুক স্বরে লাগানো পর্দাগুলির ব্যবহারে অনেক মেজাজী শিল্পীকে কোমল ধৈবত, কোমল রেখাব বা কড়ি মধ্যমের নির্দিষ্ট হারমোনিয়মের পর্দার বাইরে কণ্ঠস্বর বিচরণ করতে শুনেছি যদিও এগুলি যথাযথ কিনা জানি না। যদি যথার্থই হয় তাহলে সেই শ্রুতির ব্যবহার-চিহ্ন স্বরলিপিতে সংযোজন করতে হবে।

স্বরলিপি সংশোধনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হবে ইংরাজী ষ্টাফ নোটেশনের অনুরূপ কোন উপায়ে প্রতিটি গানের স্কেলের নির্দেশ দেওয়া যাতে গাইবার সময় শিল্পী সেই স্কেলের নির্দেশ মত গান করতে পারে যদি হারমোনিয়াম সহযোগে গান করে বা তানপুরা বা এসরাজ, হারমোনিয়ামের পর্দায় নিজ গলার প্রসার মত বেঁধে নিয়ে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে গান কর হয়। গানের স্কুলগুলিতে রীতিমত গলা সেধে প্রসার বল ও তেজ বাড়ানো দরকার। একই আসরে বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন স্কেলের গান, রেডিওতে রেকর্ডসংগীতে একই শিল্পীর পর পর বিভিন্ন স্কেলের গান, বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন স্কেলে গাওয়া গান এবং লঙ্‌প্লেয়িং রেকর্ডে একই বা বিভিন্ন শিল্পীর পর পর গাওয়া বিভিন্ন স্কেলের গান শুধু শ্রোতার কানেই বিরক্তিকর মনে হয় না রবীন্দ্রসংগীতকেও বিকৃত করে তোলে। মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রসংগীত প্রচলিত ভারতীয় গীতরীতির চর্বিতচর্বণ নয়। সে গান শুধু স্বরসংবাদ বহন করে না ভাব ও রসের সংবাদও বহন করে। সুতরাং সঠিক স্বরলিপি ও গায়নরীতির নির্দেশই আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে আশা করব। তাঁদের কাছে আমাদের প্রার্থনা এই হবে যে তাঁরা যেন অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতের প্রাথমিক স্বরলিপিকারদের মহান কীর্তি খর্বের চেষ্টা না করে রবীন্দ্রসংগীতের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং রবীন্দ্রসংগীতের ভাব ও সুরের মিলন ও উৎস অনুসন্ধানে স্নাতক ও গবেষকদের সাহায্য করেন। এখন গবেষণার বিষয়বস্তুর সন্ধান করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রে কাব্য নাট্য ও সংগীতের ভাব ও রূপের বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। ভরতমুনি নির্দেশিত নাট্যশাস্ত্রে কাব্যে ভাব ও রসের সন্ধান দেওয়া হয়েছে একটি সূত্রে, "বিভাবানুভাব ব্যভিচারী ভাব সংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তি,"—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। বিভাব অর্থে আলম্বন ও উদ্দীপন এই দুই প্রকারের বিভাব বোঝায়। অনুভাব হল নাট্যের অভিনেয় অংশ আর ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব হল ভরতের মতে তেত্রিশটি। আলম্বন বিভাব হল সেই কুশীলব যাকে কেন্দ্র করে রসের উদ্‌গম হয়। রবীন্দ্রসংগীতের দৃষ্টান্ত হিসাবে নর-নারী ছাড়াও আছে যেমন,—'ধীরে বও উতল হাওয়া' গানে উতল হাওয়া ও প্রদীপ শিখা। এক হিসাবে আবার উতল হাওয়াকে উদ্দীপন বিভাবের আওতায় আনা যায়। উদ্দীপন বিভাব অর্থে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা আলম্বন বিভাবের রসোদ্‌গম করতে সাহায্য করে, যেমন 'সেদিন দুজনে' গানটিতে চাঁদনী রাতের নির্জন পথ। 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে' গানটিতে জ্যোৎস্না রাতে বসন্তের মাতাল সমীরণ ইত্যাদি। আর তেত্রিশটি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের উদাহরণ অনেক আছে,—যেমন চিন্তা, অশ্রুপাত, ব্রীড়া, আলস্য, নির্বেদ ইত্যাদি রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে বিশেষ করে নৃত্যনাট্যে এর উদাহরণ মিলবে ভূরি ভূরি। ভরতমুনি ভাব ও রসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাস্য, ক্রোধ, রতি ইত্যাদি আটটি স্থায়ী ভাব ও তার থেকে শৃঙ্গারাদি আটটি, বিকল্পে নয়টি রসের কথা বলেছেন[১১]। রূপগোস্বামী

---

১১ নবম বা দশম শতকের অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ রুদ্রট তাঁর কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে ভরত বর্ণিত আটটি রসের সঙ্গে প্রেয় এবং শান্ত এই দুটি রস জুড়ে দিয়েছেন। তিনি সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন।

প্রণীত "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে দশম রস হিসাবে ভক্তিরসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই গ্রন্থের টীকাকার জীবগোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন যে মধুররসেই ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ স্বাদ এবং অনেক ভক্ত যদি শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিকে ভক্তি বলে বুঝতে পারেন এবং তার জন্য উন্মুখ হন তথাপি মধুর বা উজ্জ্বল রসকে তাঁরা কামাভিব্যক্তি মনে করে সেই রসাস্বাদনে বিমুখ থাকেন। রবীন্দ্রসংগীতে 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা গানগুলো অনেক ক্ষেত্রে এই রসের অবতারণা করে।

আমরা নাট্যশাস্ত্রের সূত্র ভাল করে অনুশীলন করবার পর রবীন্দ্রসংগীতের গানগুলি বিভিন্ন রসের পর্যায়ভুক্ত করে নিতে পারি এবং বিভিন্ন বিভাব ও ব্যভিচারী ভাবের অভিব্যক্তিগুলিকেও চিহ্নিত করতে পারি। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক,—

১ 'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে' একটি চমৎকার নাটকীয় ভাবের গান। মূলরস শৃঙ্গার। উদ্দীপন বিভাব নিদাঘ, নির্জন দ্বিপ্রহরে বটবৃক্ষের ছায়ায় রাখালবালক ও একটি বালিকার আলম্বনে একটি ছোট ঘটনা। সঞ্চারী ভাব ধৃতি, চিন্তা ও অশ্রু। সুরের আ···আ অংশে সুন্দরভাবে বিলাপের অশ্রুপাতের অনুভাব দেখানো হয়েছে।

২ 'সেদিন দুজনে' গানখানিও মোটামুটি একই ভাব ও রসের অভিব্যক্তি। এর উদ্দীপন বিভাব হল চাঁদনী রাতে বনের মধ্যে দোলনায় দোলা, আলম্বন নর ও নারী। এখানেও ধৃতি, চিন্তা ও বিলাপের অশ্রুপাতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এমনি করে আমরা বিভিন্ন উদ্দীপন বিভাবের কয়েকটি গান যেমন,—

৩ আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে—শরৎ

৪ আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার—বর্ষা

৫ একদা তুমি প্রিয়ে—বসন্ত

৬ যখন ভাঙল মিলনমেলা—প্রেম

এই গানগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে পারি এবং গানের ভাব ও রসগুলির সুরের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারি। গানগুলির রাগরাগিণী বিচার না করে আমরা বিভিন্ন রঞ্জনশক্তি-সম্পন্ন স্বরগুচ্ছের প্রাধান্য ও বাদীস্বরগুলির বিচার করব।

অমিয়নাথ সান্যাল "Ragas and Raginis" গ্রন্থে একটি এ ধরণের বিচারপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। সেই বিচার গানগুলির স্থায়ী অংশের স্বরলিপিগুলি নিয়ে করতে হবে। দেখতে হবে এই স্থায়ী অংশের বাদী স্বর কোনটি। আমরা গানের স্থায়ী অংশ নিয়েই বিচার করব। কারণ রাগ-সংগীতের স্থায়ী অংশটুকু যেমন প্রাথমিক রাগ-পরিচিতি ঘটিয়ে দেয় তেমনি কাব্যসংগীতের রসভাবাদিও গানের স্থায়ী অংশেই উপলব্ধি করা যায়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও উদ্ধৃত করা যেতে পারে, "অস্থায়ীতেই সুরের বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক

অন্তরা জুড়ে দিতে হয়।" যাই হোক এইভাবে আমরা কয়েকটি সমভাবাপন্ন রবীন্দ্রনাট্যসংগীত নিয়ে ছয়টি গানের সুর বিশ্লেষণ করে দেখেছি যার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল,—

	গানের কথা	বাদীস্বর	সম্বাদী	মূলস্বরগুচ্ছ
১	দূরদেশী ঐ রাখাল ছেলে	রা	পা	রা মা পা ণা
২	সেদিন দুজনে দুলেছিনু	জ্ঞা	পা	সা জ্ঞা পা ণা
৩	আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার	পা	জ্ঞা	সা জ্ঞা পা ণা
৪	যখন ভাঙ্গলো মিলন মেলা	সা	জ্ঞা	{ সা জ্ঞা পা ণা স জ্ঞা পা দা
৫	যেদিন সকল মুকুল	পা	রা	রা মা পা ণা
৬	একদা তুমি প্রিয়ে	ণা	পা	{ সাজ্ঞা পা ণা রা মা পা ণা

গানগুলি স্বরব্যবহারের দিক থেকেও কিছুটা সমভাবাপন্ন বলে মনে হয় এবং প্রায় প্রত্যেক গানে পঞ্চম হয় বাদী না হয়ত সম্বাদী এবং প্রায় গানেই কোমল নিষাদ রাগ বন্ধনে সাহায্য করেছে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি নাটকে জাতীরাগের ব্যবহার ও তার রীতি নিয়ে বলেছেন যে নাটকের কোনও অঙ্কের আরম্ভে বা মধ্যে নাটকের স্থানবিশেষের রসবিচার করে জাতীরাগের ব্যবহার করতে হবে। কোন কোন রসভাবের প্রকাশ হবে কোন কোন স্বরে তারও নির্দেশ তিনি একটি শ্লোকে বলে গেছেন,—

"হাস্য শৃঙ্গারয়োঃ কার্যৌ স্বরৌ মধ্যম পঞ্চমৌ।
ষড়্জর্ষভৌ চ কর্তব্যৌ বীর রৌদ্রাদ্‌ভুতেস্বথঃ॥
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তব্যৌ করুণে রসে।
ধৈবতশ্চ প্রযোক্তব্যো বীভৎসে স ভয়ানকে॥"[১২]

এখানে বলা হয়েছে শৃঙ্গার রসে পঞ্চম স্বর ও করুণে নিষাদ। এখানে অবশ্য মোটামুটি ভাবে ভাব, রস ও সুর প্রযুক্তির প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি গান মিলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের সমগ্র রবীন্দ্রসংগীত এই ভাবেই বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। রাগসংগীতের আলোচনায় কাব্যবিচার

১২ অর্থাৎ ম ও প হাস্য ও শৃঙ্গার, স ও র বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত, গ ও ন করুণ এবং ধ বীভৎস ও ভয়ানক রসোৎপাদক স্বর। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নবরসের বিভাজন করেছেন,—কোমল ঋ ও কোমল দ যুক্ত রাগ শান্ত ও করুণ রসে। তাঁর মতে এ ছাড়া,—শুদ্ধ র ও ধ যুক্ত রাগে শৃঙ্গার রস এবং কোমল জ্ঞ ও নি-যুক্ত রাগে বীররস উৎপাদন করে থাকে।

আমরা প্রাচীন মতটিকেই বহাল রেখেছি। ভরতের নাট্যশাস্ত্র আনুমানিক ১ম বা ২য় শতকের।

অপাংক্তেয় হতে পারে কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কাব্যবিচারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। গবেষক শুধু সংগীতজ্ঞ হলেই হবে না তাঁকে কাব্যরস সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হতে হবে।

সুতরাং যে সমস্ত গানের সুর প্রচলিত হয়ে গেছে সেগুলির স্কেলগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হলে আমরা বাদীস্বরগুলির প্রয়োগ লক্ষ্য করতে পারি। শৃঙ্গার রসে যদি পঞ্চম বাদী হয় তাহলে শৃঙ্গার রসাত্মক গানে যে সুরটি বহুল ব্যবহৃত সেই সুরকে পঞ্চমে বাদী হিসাবে স্থাপন করে স্বরলিপি করতে পারি। মোট কথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি গানের পর্দার অযথা অদল বদল করায় মনোনিবেশ না করে এই ধরণের গবেষণামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন তবেই তাঁদের উপর রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও প্রয়োগ ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। দিনেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় আমরা যে রবীন্দ্রনাথের গানে সুরগুলি যথাসম্ভব সঠিক ভাবে ধরে রাখতে পেরেছি সেই কথা মনে রেখেই তাঁর স্বরলিপিকে প্রামাণ্য বলে ধরে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

কোনো গীতিকবি বা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধে বিচার করবার সময়, তাঁর সমগ্র আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত ক্রমবিকাশের রূপ সমঝ্‌দার বিচারকের চোখে ধরা দেয়। বাহিরের রূপ, রস, গন্ধস্পর্শের তরঙ্গাঘাত শিল্পীর মর্ম-বীণার তারে যে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তাই তাঁর অনুভূতির আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে নানা রসসৃষ্টির উৎসধারায় উৎসারিত হয়। অন্তরের ভাবলোকের এবং বাহিরের সৌন্দর্য লোকের মিলনে যে পুণ্য সঙ্গমতীর্থ রচিত হয়, তারি কেন্দ্রস্থলে সকল প্রয়োজনাতীত অনির্বচনীয় রূপ-সৃষ্টিগুলি আপনার পূর্ণ মাধুর্যে বিকশিত হয়ে বলে "অয়ম্ অহম্ ভো"!—এই আমি আছি। যখন এই প্রাণবান্ সত্তা বর্তিয়া থাকার আনন্দের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে, তখন শাশ্বত আনন্দলোকে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বাহিরের প্রভাব তখন তার অন্তরকে স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষুব্ধ করে না।

শিল্পসৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে যে তর্কজাল বোনা হয়েছে, তাতে আবদ্ধ হয়ে বন্ধনদশাকাতর অনেক লোক অনেক আর্তনাদ করেছে ; অনুভব করার জিনিসকে বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছে ; indefinable-কে define করবার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদ করেছে ; অনুভূতির দ্বারা সেই রসসৃষ্টির সুষমার অপূর্ব সৌষ্ঠব তারা উপলব্ধি করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করে দেখ্‌বার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত তাঁর নব নব সুর সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখ্‌তে গেলে যে দূরদৃষ্টি ও শক্তির প্রয়োজন, তা আমার নেই ; তবে আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যতটুকু বুঝেছি, তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর্‌ছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতেন এবং সাহিত্য আলোচনা ও রচনায় উৎসাহিত হতেন, এ কথা তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন। বঙ্কিমযুগের নবজাগরণের প্রথম প্রভাতের অরুণালোকস্পর্শে তাঁর প্রতিভার উদ্বোধন হয়েছিল, এবং পিতা, ভাই, ভগ্নী, সকলের স্নেহচ্ছায়ে ও উৎসাহের অনুকূল বায়ুতে তাঁর নব উন্মোচিত প্রতিভা উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ, রসানুভূতি ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। আমাদের পরিবারে গান বাজনার চর্চা বড় কম ছিল না। বড়ো বড়ো ওস্তাদ এসে সেরা সেরা হিন্দী গান (বেশির ভাগ ধ্রুপদ) গাইতেন। আর সেই সুরগুলিতে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রাহ্মসমাজের

সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য গান রচনা করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়নমগ্ন; পিয়ানোতে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর গৎ বাজাচ্ছেন আর তাতে কথা বসিয়ে গান তৈরী করছেন কবি নিজে। এই হলো গীতরচনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। বাহিরের প্রভাব এবং tradition এর ধারা যুগপৎ তাঁকে রসের খোরাক জোটাতে লাগ্‌ল। মাঝে মাঝে স্বকীয় প্রতিভার রশ্মি tradition এবং ওস্তাদীর গবাক্ষদ্বারের ভিতর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল, কিন্তু আবরণ বিদীর্ণ করে নিজস্ব প্রতিভার দীপ্তি তখনও উদ্ভাসিত হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন পাপক্ষয় করবার একান্ত আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও ভাবাবেগে গান লিখলেন—"আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে পথ ভুলি হে।" ছ'জনার তাড়নায় কাতর ভাবপ্রবণ অশ্রুবিলাসী শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু বীণাপাণির আসন তখনও শূন্য ছিল। একথা লিখলুম বলে পাঠক ভাববেন না যে, তিনি সে সময়ে উচ্চদরের সঙ্গীত রচনা করেন নি। পরবর্তীকালে যদুভট্ট এবং রাধিকা গোস্বামীর কাছ থেকে সুর আদায় ক'রে তা'তে কথা বসিয়ে যে সব ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন, তা অপূর্ব বাক্য-যোজনায় এবং বীর্যদ্যোতনায় অননুকরণ সম্পদে মহীয়ান।

এরপরে দেখা যায় classical সুরগুলির বিশিষ্ট রস আত্মসাৎ ক'রে তিনি গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। "বাল্মীকি প্রতিভা" ও "মায়ার খেলা"র গানে classical প্রভাব সুস্পষ্ট। এই গীতনাট্য দুটির গানগুলি কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনের অপূর্ব উদাহরণ। এই সময় আরও কতকগুলি গান রচিত হয়, যার lyrical beautyর তুলনা নেই। বাল্যকালে আমি সে গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতুম, তৃপ্ত হতুম, আর আপন মনে গেয়ে যে কী আনন্দলাভ করতুম তা কথায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর সমস্ত একান্ত intimate সম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে কোন্ স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হতুম কে জানে! গানগুলি হচ্ছে "আকুল কেশে আসে," "আহা জাগি' পোহাল বিভাবরী," "আজি শরত তপনে", "তোমারে গোপন কথাটি" ইত্যাদি। কথার অর্থ আমার কাছে এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, সে সময়কার কোন রবীন্দ্রবিদ্বেষী যখন আমাকে বল্লেন যে, রবীন্দ্রনাথ "আহা জাগি পোহাল বিভাবরী," এ গানটি কোন প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, তখন যে কী আহত হয়েছিলাম বল্‌তে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে এরূপ বস্তুতান্ত্রিক অর্থ অনেকেই করত।

রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ের গানগুলিকে emotional আখ্যা দিয়েছেন। Emotional তো বটেই! Lyric মাত্রই emotional, কিন্তু সে emotion intimate নয়। এ যেন ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত কোন্ এক অক্ষুব্ধ সরসীনীরে বিকশিত শতদল—"তার বাঁধন যে নাই।" এই detachment হল art এর মূল কথা।

কবির সমস্ত কাব্যজীবনের ধারার মধ্যে দেখতে পাই তিনি অধ্যাত্ম জগতের এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান; অতীত, ভবিষ্যতকে অতিক্রম করে শাশ্বত আলোকের আনন্দে উদ্ভাসিত। এ দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্যবাণীর অব্যাহত স্রোত বৈদিক যুগ থেকে এ কাল পর্য্যন্ত বয়ে আস্‌ছে, এবং নানা যুগের নানা সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সমাধানে উপনীত হয়েছে।

এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ human interest। আমার তো মনে হয় যে তিনি intensely human। আর একদিকে দেখতে পাই তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি। যা-কিছু প্রাণবান, যা কিছু আপনার আনন্দবেগের প্রেরণায় আপনাকে নিঃশেষে দান করেছে এবং নব নব জীবনের পূর্ণতায় বিকশিত হচ্ছে, তাকেই তিনি একান্ত আপনার করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত "ছিন্নপত্র" বইটি যিনি পড়েছেন, তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন আমি কেন এ কথা বল্‌ছি। অধ্যাত্মজীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে মানুষ এবং প্রকৃতির ব্যবধানের বাঁধ ভেঙে গেছে, দুই-ই তাঁর পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে।

সত্যের চরম উপলব্ধির শাশ্বত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন বাণীর বরপুত্রের আসনে আসীন, তখন তাঁর সুরশিল্পসাধনার পূর্ণ পরিণতি দেখ্‌তে পাই। যে কথা নানারূপে নানা ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে, তা সুরের ব্যঞ্জনায় অরূপ মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দলোকের রহস্যের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। ধ্যানসমাহিত চিত্ত সুরের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছে ব'লে অন্তরের সুরের নির্ঝরিণী কলস্বরে ধাবমান—"কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

কবির আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ অপূর্ব বাণীর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভাবের মিল আছে, একথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু বাণী এবং সুরের অপূর্ব মিলনে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আদর্শ-স্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি, যার আরম্ভ 'গীতপঞ্চাশিকা'য় এবং 'গীত-বীথিকা'য়। পরবর্ত্তী রচনায়—'নবগীতিকা' এবং 'গীতিমালিকা'র গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এ গানগুলিতে দেখতে পাই সুরের surprises। শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিমাধুর্য দেখে মনটা যেমন চম্‌কে ওঠে, এও সেইরকম। কথাগুলো ভালো-মানুষের মত মগজের এক কোণে চুপ করে পড়েছিল। সুরগুলো নৃত্যচপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটি অপ্রত্যাশিত রূপদান করলে, যা দেখে রসিক-চিত্ত বল্‌লে "বাঃ, এরকমটি তো ভাবিনি!" আমার মনে হয় কবি হয়তো নিজেই জানেন না কেমন করে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative design গুলো তৈরী করল—যার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যে সুরটা গড়ে উঠল, সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়। তা সম্পূর্ণ খেয়ালী। জ্ঞানলব্ধ দুর্বিদগ্ধ বল্‌বেন, "হেঁয়ালী"।

গান তৈরী করবার সময় তাঁর কাছে বসে থেকে আমার বারবার মনে হয়েছে যে, সুরের পাগলামীকে তিনি কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারছেন না;—খাবার তাড়ায়ও না, কাজের তাড়ায়ও না। একটা গানের সুর দিচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে—"একটুকু ছোঁয়া লাগে"। সুর অভিমানিনী প্রেয়সীর মত মুখ ঘুরিয়ে বসল, মানভঞ্জনের পালা শেষ করে কবির মন যখন সুরকে লক্ষ্য করে বললে "আচ্ছা নাও, তোমার হাতে আমার বাণী সমর্পণ করলুম"—অমনি গানটি তৈরী হলো, কথা বললে আমি ধন্য, সুর বললে আমি পূর্ণ। আমার মূল বক্তব্য এই গানগুলির সম্বন্ধে এই যে, মধ্যযুগের কবিদের সঙ্গে বাণীর ভাবের মিল থাকতে পারে, কিন্তু গান হিসাবে অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির হিসাবে কবির গানগুলিকে বোধহয় আরও উচ্চস্থান দেওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ আমার এই মনে হয়, "বুঝিবে কী ধন রসিক যে জন।"

ঋতুসঙ্গীত সম্বন্ধে দু চার কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি। "বসন্ত" ও "সুন্দর" এ দু'টি কবির অপূর্ব সৃষ্টি। অনেক কবি প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার জয়গান করেছেন শতমুখে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার রসমাধুর্য উপভোগ করে তার সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধস্থাপন এবং তার রহস্যলোকের দ্বার উদ্ঘাটন আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানিনে। প্রত্যেক কিশলয়ের অব্যক্ত কাকলিতে, প্রতি কুসুমের বর্ণগন্ধময় আত্মনিবেদনে, প্রতি ঋতুসমাগম ও অবসানের মিলন-বিরহের বেদনায় কবির মন আনন্দে আকুল ও বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাইরের বিরহ মিলনের অন্তরালে যে মায়াময় রহস্যলোক রয়েছে, তার অরূপ মাধুর্যের সন্ধান, পাওয়া না-পাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন পেয়ে কবির মন গেয়ে উঠল "ওকি এল ওকি এল না।" গভীর অনুভূতির আনন্দ যেমন মানুষকে সুখদুঃখের মিলনবিরহের জন্মমৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে, তেমনি প্রকৃতিও অন্তর্নিহিত গভীর সত্তার পরিব্যাপ্ত চৈতন্যে উদ্বোধিত হয়ে প্রাণের নব নব প্রকাশে জয় পরাজয়ের বাণী নিত্যনিয়ত ঘোষণা করছে। এই বিজয়বার্তার সান্ত্বনার বাণী, এই একান্ত আত্মীয়তার রূপ কবির ঋতুসঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ভট্টাচার্য মহাশয়দের একান্নবর্তী পরিবার এতদিন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছিল। সকালে ঠাকুরপূজো থেকে আরম্ভ করে, শ্রীমণ্ডপের সান্ধ্যসম্মিলনের তাসভাঁজা ও তামাক-সাজা পর্যন্ত এমন সুনিয়ন্ত্রিত ছিল যে, দেখে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হত যে হ্যাঁ—একটা সদ্‌ব্রাহ্মণ বটে। বাহ্যিক এবং আন্তরিক দুই প্রকার শাসনের দৃঢ়বন্ধনে বাড়ির ছেলেমেয়ে বড়-ছোটো এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, তাহারা সচল কি অচল—এ প্রশ্ন অদ্যাপি কারো মনে জাগেনি। বাহিরের অশুচিসংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে এমন পবিত্র জীবনযাপন কলিকালে দুর্লভ। অন্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীদের অস্তিত্ব এমন রহস্যময় যে, তাঁদের কর্মজীবনের ক্ষুদ্র পরিধির দুর্গপ্রাকার ভেদ করে এমন সাহস বিশ্বচারী আলো-বাতাসেরও ছিল না—মানুষের কলুষদৃষ্টি তো দূরের কথা। এ হেন পরিবারের বহুযত্নগ্রথিত কারাপ্রাচীরের লৌহদ্বারের অর্গল ভেঙে অর্বাচীন ছোকরা এক যখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে এক লাফে নেমে নিম্নশ্রেণীর মজুরদের সঙ্গে জুটে, তাদের সর্দার হয়ে Liverpool সহরের নৌ-কারখানায় পৌঁছল, তখন বাপ তাকে ত্যজ্যপুত্র করলেন, মাতৃব্য-পিতৃব্য সবাই তার নরকগমনের পথ সুপ্রশস্ত করলেন, আর ছেলেপিলেগুলো আমবাগানে ঢুকে বলাবলি করতে লাগল—আমরা একবার লুকিয়ে সাহেবের খানসামার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রুটি-মাখন মুর্গির ডিম খেয়েছিলুম, দাদা বোধহয় রোজ তাই খাচ্ছে,—কি মজা।

Liverpool থেকে বিবিবৌ নিয়ে যখন দেশে ফিরল, বাড়ির চৌকাঠ পেরোবার আগেই বাপ বল্লে—দূর হও! অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র বল্লে—তথাস্তু, তোমার বাঁধন তোমার থাক, আমার পথযাত্রায় আমায় মুক্তি দাও।

অক্ষুব্ধ শান্তিসমুদ্রে অশান্তির ঝঞ্ঝা এসে লাগল। দুইয়ের সংঘাতে অন্তরের ও বাহিরের প্রাণতরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল। বাঁধন গেল ছিঁড়ে, বাধা গেল ধূলিসাৎ হয়ে, আর এই ভগ্নস্তূপের উপর আনন্দযজ্ঞের হোমশিখা দীপ্ততেজে জ্বলে উঠল।

নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে বাস করলে বিপদ হয় এই যে, তার ফলে জড়তা ও অবসাদ এসে শান্তি অশান্তির দ্বন্দ্বসম্ভূত সৃষ্টির প্রেরণার উৎসকে আপন সৃজনবেগে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্টি; সুখদুঃখের আলোড়নের ফলেই আনন্দের চরম প্রকাশ।

আমাদের সঙ্গীতের অবস্থাও কতকটা এইরকম। Classical music বলতে আমরা বুঝি হিন্দী গান। তার বড় বড় ইমারৎ, কেল্লা ফৌজ, তার প্রাকারের পর প্রাকার, প্রাচীরের পর প্রাচীর দেখে

স্তম্ভিত হই, বাহবা দিই। প্রাচীন-স্মৃতিসৌধরক্ষা সমিতি সেগুলি সযত্নে রক্ষা করছেন, কিন্তু দৈনিক জীবনযাত্রায় সেগুলো কোনো কাজে লাগে না। সেই বিরাট প্রাসাদরচনার মালমশলা নিয়ে নিজের মনের মত করে ছোটখাটো কুটীর রচনা করেই আমার আনন্দ।

লোকসঙ্গীতের ধারা আজও বহমান, কেননা জীবনের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। প্রাণের সঙ্গে যে সৃষ্টির যোগ নেই, তাকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ রাখা চলতে পারে, কিন্তু সর্বমানবের আনন্দযজ্ঞে বিতরণেব যোগ্যতা তাব থাকে না—এটা সর্ববাদীসম্মত।

আমি যখন ভৈরবী সুরের আলাপ করি, তখন বিশ্বের পুঞ্জীভূত ব্যাকুলতার সুর তা'তে বেজে ওঠে; এই ব্যাকুলতার সকরুণ মিনতির সুব আমাকে অভিভূত করে। মল্লার রাগিণীর যে বিরহ-বেদনাব আকুলতা, তা' সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমার বেদনা যখন ভাবরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে কথা ও সুরেব মিলনে আত্মপ্রকাশ করে, তখন যে ভৈরবী বেজে ওঠে সে আমার ভৈরবী;—আমার বিরহবেদনায় যে মল্লার বাজে, তা' আমার মল্লার। মালমশলা যদি ভৈরবী এবং মল্লারেরই থাকে, তবে ইমারৎ যেটা তৈরী হয়, সেটা আমার তৈরী; তাই তার ভৈরবীতে শুদ্ধ রেখাবও লাগে, কড়ি মধ্যমও লাগে। আমাব কারখানায় তৈরী সুরের আনন্দ আমি জগৎকে বিতরণ করছি, কিন্তু আমার কারখানার দ্বারে বড় বড় অক্ষরে জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে, "no thorough fare!" আমার সহমর্ম্মী রসিকের বীণাব তারে আমার সুর যে ঝঙ্কার তুলবে, সে ঝঙ্কার আমার সুরের সৌন্দর্যের সমগ্র রূপকে অক্ষুন্ন রেখেই বাজবে।

হিন্দী গানে অধিকাংশ স্থলে সুরকেই প্রাধান্য দেয়, কথাকে নয়। তাই তানের বাহুল্য হিন্দী গানে সম্ভব হয়। বাংলা গানে যেখানে কথার আঁটবাঁধুনী, সেখানে খোঁচখাঁচ মীড় ছাড়া তান চলে না। হিন্দী গানে সেইজন্য সারগমও ঢোকানো সম্ভব, কেননা গাইবার সময় গায়ক রসবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও জানিয়ে দেন যে—দেখছ, আমি যেটা গাচ্চি এটা গুণক্রী, পূরবী নয়; কেননা শুনলে তো নিখাদবর্জিত আর কড়ি মধ্যমও লাগাই নি।

কিন্তু আমার মন যখন গায় "জননী তোমার করুণ চরণখানি হেরিনু আজিকে অরুণ কিরণরূপে" —তখন আমার সুরলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেন "লাগুক নিখাদ ও কড়ি মধ্যম, কথায় সুরে মিলেছে খাসা; না হয় গুণক্রী না হয়ে নির্গুণক্রীই হল, কুছ পরোয়া নেহি।"

হিন্দীগানে সেইজন্যে একথা বলে দেবার প্রয়োজন হয় যে—আমি পূরবী গাচ্চি। সেই পূরবীর বিশেষ ঠাটকে আশ্রয় করে আমার গান গাওয়া হল; কথার মধ্যে দিনান্তের করুণ মিনতির আভাসমাত্র নেই বলে সুর গেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় যে, এটা দিন অবসানে গাওয়া উচিত; প্রকৃতির বুকে ভিতরকার কান্নার সুর আমি পূরবী রাগিণীতে রূপান্তরিত করেছি। কিন্তু আমি যখন গাই:—

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
সন্ধ্যা বায়ে, শ্রান্ত কায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে"

তখন সুরটা পূরবী হতে বাধ্য, কিন্তু বলবার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং তাতে শুদ্ধ ধৈবত লাগালেও সৌন্দর্যের লাঘব হয় না।

বাংলা গানে যেখানে-সেখানে তান দেওয়া যায় না এইজন্যে যে, বাংলা গানের কথারও একটা ঠাসবুনানী আছে ; তার সুরকে বাদ দিলেও কথার নিজস্ব রসসম্পদ রয়েছে। কাজেই একটা কথা শেষ করে বাকি কথাটা না বললে, উক্ত কথা বড় বিপদে পড়ে। কেমন হয় জানো ? যেমন, আমি যদি গাই "যদি বেলা যায় গো বয়ে" আর তারপরে যদি ক্রমাগত বলতে থাকি "যায় গো বয়ে" ; তাহলে তার পরের দুই লাইন

"জেনো জেনো আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে"

চীৎকার করে বলতে থাকবে—ওহে, থামহে, আমার কথাটাও বলে ফেলো, তাহলে অর্থটাও সম্পূর্ণ হয় আর লোকেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আজকাল আর একটা কথাও উঠেছে যে, একটা গান বারবার একই রকম করে গাইলে একঘেয়ে হয়ে যায়, তাই প্রতিবার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা দরকার। এর সম্বন্ধে বলা যেতে পারে ঐ একই কথা যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন হিন্দী গানেতেই চলে ; কেননা হিন্দী গানে কথা ও সুর মিলে একটা সুসম্বদ্ধ অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে না। গাইচি গুরুগম্ভীর রাগিণী—সুহা কানাড়া ; তাতে কথা বসালুম "বলমা রে চুনারিয়া ম্যয়কো লাল রঙাদে", অর্থাৎ "হে বল্লভ, আমার ওড়নাটা লাল রঙে রঙিয়ে দাও।" এ চুনরিয়াকে কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত ক্রমাগত টান মারা চলতে পারে ; কিন্তু ঐ সুরই বাংলা কথায় খাপ খাইয়ে "নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও" গাইবার সময় সে টান সইবে না।

আমি যখন শিল্পীর আসনে অধিষ্ঠান করে রসসৃষ্টি করচি তখন তার ছাপটা নষ্ট করে নিজের কার্‌দানী দেখানোকে বলা যায় অনধিকার বা মূঢ়তা। গোলাপ যে ফুটেছে, সে গোলাপই থাকবে ; তাতে বেলফুলের শুভ্রতা ও সৌরভ আশা করার মত এমন পাগলামী আর কিছুতে হতে পারে না। এক সুরে গাইলে যদি গান একঘেয়ে হয়, তবে দোষ হয় গায়কের নয়—শ্রোতার। আর দুয়েরই যদি দোষ না থাকে, তবে তা Thing of beauty নয়, এবং joy for ever দাবি সে করতে পারে না। তোমার যদি সাদা রসগোল্লা রোজ ভাল না লাগে, অতুলের দোকানে কড়া পাকের রসগোল্লার ফরমাস দাও। কিন্তু বেচারী সাদা রসগোল্লাকে সাদাই থাকতে দাও। তোমার না ভালো লাগে, আর কারও ভালো লাগতে পারে ; পৃথিবী থেকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এখনও লুপ্ত হয়নি। তা না করে তুমি যদি গায়ের জোরে সাদা রসগোল্লায় গুড় মেশাও, তবে রসগোল্লার রসত্ব এবং গুড়ের গুড়ত্ব দুই-ই মাঠে মারা যাবে। আর মিষ্টি যদি একেবারেই ভালো না লাগে, তবে বুঝতে হবে পিত্তাধিক্য হয়েছে চিকিৎসার দরকার।

আমার মন বলচে কথায় ও সুরে মিলিত একটি অখণ্ড সুসম্পূর্ণ রসসৃষ্টি করব। সেটা যখন হল তখন দেখা গেল যে সুরে টৌড়ির আমেজ এসেছে। এসে থাকে যদি তবে "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।" সে টৌড়ি যদি জীবনপুরী না হয়ে বোলপুরী হয়--তাতেই বা ক্ষতি কী ?

বীণ

নীরব বীণা

মোর নীবব বীণা কতকালের
কত না অনাদরে,
ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে !

কেন যে আছে জানে না তাও,
এবার তারে বুঝায়ে দাও ,
কি সুরে হাসে, কিসে কাঁদাও,
নিজ ইচ্ছা ভবে

ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে !
তুমি আপন কোলে লহ তুলে
এ যে তোমার বীণা,
দেখ তোমার সুরে মিলিয়ে সুর
এবার বাজে কিনা !

আপনি যবে বাজাতে যাই,
বেসুর বেজে ওঠে সদাই
রেখেছি আশা লইবে তায়
তুলিয়া নিজ করে,
ও সে তোমার সভা-গৃহের কোণে
রয়েছে একা পড়ে ।

বন্ধন

সেদিন যে তুমি গিয়েছিলে খুলে চুলটি,
তুলায়ে করেতে মোহন কমল ফুলটি,
একটি ক্ষুদ্র পাপড়ি তাহার,
খসে' পড়েছিল বক্ষে আমার,
বেগে বহেছিল পরশে যাহার
আমার হৃদয়-ধমনী,
হে মোর চিত্ত-হরণি!

কি জানি কানেতে বেজেছিল কোন কথা কি
শুনিতে তাহাই আজি এ মরম ব্যথা কি!
সব কাজে আজি এ মোর পরাণ
ব্যাকুল শুনিতে তব প্রেমগান;
কর আজি মোরে, কর আহ্বান
বাহি' এস তব তরণী;
হে মোর চিত্ত-হরণি!

একবার শুধু মিলাও আঁখিতে আঁখিটি,
কর মোরে তব স্বর্ণ খাঁচার পাখিটি!
বদ্ধ করিও শৃঙ্খলে তব,
তোমার বন্দী চিরদিন রব;
অনিমেষে তব মুখ অভিনব
হেরিব দিবস রজনী!
হে মোর চিত্ত-হরণি!

এমনি রহিব চিরদিন মোরা দু'জনায়,
তুমি গো মুক্ত, আমি বাঁধা তব পিঁজরায়!
অক্ষয় থাক্ এ মোর বাঁধন,
অনন্ত হোক্ এ প্রেমসাধন!
আশাভরা মোর আকুল কাঁদন
চেয়ে আছে তব শরণি!
হে মোর চিত্ত-হরণি!

হৃদয়-তীর্থ

সখি, প্রতিদিন তুমি মেলেছ নয়ন
উষার উদয় পানে গো ;—
কত না প্রভাতে আকুল শ্রবণ
কত বিহঙ্গ গানে গো।
হিমভারাতুর কুসুমের হিয়া
কত না অশ্রু ফেলেছে মুছিয়া
কত পরশন-স্মৃতি-বিজড়িত
পবন সুরভি আনে গো।
তারি মাঝে তুমি মেলেছ পরাণ
রজনীর অবসানে গো।

সখি, আমারও চিত্ত-উদয়-শিখরে
হের উষা নামে সুধীরে,
রাতুল চরণ শিশির-শীকরে
ওঠে ফুটে ঘন তিমিরে।
হেথাও অমল ফোটে শতদল
ঝরে ঝরঝর বরিষার জল,
কুঞ্জবিতানে ফোটে কদম্ব
নাচায়ে চিত্ত-শিখীরে।
সেথা এস নেমে ঘন তরুছায়ে
হৃদয়ের তটে সুধীরে।

সখি, অস্ত-পারের রাঙিমা হেথায়
জ্বলে দিবসের দহনে,
আকাশে যে তারা মিটি মিটি চায়
ফোটে তা হৃদয়-গহনে
পূরণিমা রাতে যেই সুধাকর
রহে জাগি চির বিরহ-কাতর,
বেদনার রসে করে বিহ্বল
নিঝুম নিশীথ স্বপনে।
একা সেই জাগে আমার নীরব
আঁধার চিত্ত-গগনে।

সখি, বিশ্বহৃদয় নির্ঝরধারা
এইখানে নেমে এসেছে,
তটবন হতে কত পথহারা
ফুলফল স্রোতে ভেসেছে
মহাসাগরের রূপের লহর
আছাড়ে হেথায় দিবস প্রহর,
কত বিচিত্র মরমের কথা
একসুরে হেথা মিশেছে !
কত হাসি, কত অশ্রুসলিল
এইখানে নেমে এসেছে !

সখি, হৃদয়ের নীরে নেমে এস ধীরে
স্নান কর তব সমাপন,
হেথা সুনিভৃত গহন তিমিরে
ফেলিও চরণ সুগোপন !
তব বিরহের গীত যত ব্যথা,
আমার মরমে লভি' নীরবতা,
অকথিত ভাবে কত না কাহিনী
হবে তোমা সাথে আলাপন
যত কথা তব আছে,—যত গান,
হেথা এসে কর সমাপন !

আত্ম-গৃহ

হে ভারত ! তোমার এ শ্যাম-স্নিগ্ধ ছায়া-কুঞ্জ 'পরে,
কুসুমে পল্লবে ধান্যে বিকশিত উদার প্রান্তরে,
যে মহান্ গ্রন্থখানি সম্মুখেতে রাখিয়াছ খুলি,'
তার ভাষা দাও শিখাইয়া ! অতীতের স্মৃতিগুলি,
স্তব্ধ যাহা বহুদিন, স্পন্দিত জাগ্রত করি তারে
ধ্বনিত করিয়া তোলো ! এ মহান্ জলধির পারে,
দূরদূরান্তরে তার পাঠাইয়া দাও সমাচার !
অবসাদ-ক্লান্ত প্রাণে নব প্রেম করহ সঞ্চার,
নব আশা ! উৎস যথা রুদ্ধ-বারি ধরা হতে টানি'
উচ্ছ্বসিত করে তারে, তেমনি তোমার মহাবাণী
প্রেমের মঙ্গল-ধারা বক্ষ হতে হরি' লয়ে আজ
উৎসারিত করি দিবে দিকে দিকে ধরণীর মাঝ !
তুমি তো রাখনি দূরে কাহারেও, আপন যে নয়
তারেও ডাকিয়া ঘরে চিরদিন দিয়েছ আশ্রয় !
তবে কেন হে জননি, যা'রা তব আপন সন্তান,
ছাড়িয়া তোমার ক্রোড় পরদ্বারে পায় অপমান ?
পর হ'তে পারে, তবু আপনারে পারে না বুঝিতে
ঘরে শত্রু আছে বসে', যায় মূঢ় পরেরে যুঝিতে ।

দুর্ভাগ্য

তোমার এ পুণ্যস্বচ্ছ জাহ্নবীর তীরে
হে বঙ্গজননি ! তব কুটিরে কুটিরে,
যে পুরাণো শান্ত শক্তি ছিল সঙ্গোপনে,
আজি কোন বায়ু-বেগে, কোন শুভক্ষণে
এ ধূমান্ধ নগরীর বাতায়ন পথে
প্রবেশিল তারি কণা আজি কোনমতে ।
সন্তানের মৃত দেহে করেছ সঞ্চার
ঈষৎ চেতনা, তাই আশা বাঁচিবার ।
নাহি তবু বল মনে, নাহি বীর্য দেহে,
তাই আজি নাহি আশা এ দরিদ্র গেহে ।
হিংসার প্রলয়-বাণ চাহে ত্যজিবারে
পরেরে নাশিতে ; তবু দুর্ভাগা না পারে
মঙ্গল শান্তির তরে দিতে বলিদান
আপনার স্বার্থপুষ্ট, দীনহীন প্রাণ ।

আত্মদান

মধ্যাহ্নে ঘিরিয়া ছিল খর রবি-দাহ,
আঁধারিয়া ক্ষণ পরে এল বারিবাহ।
সরস অমৃতধারা বক্ষ মাঝে চাপি',
রসের আবেশখানি রেখেছিল ঝাঁপি',
আচম্বিতে কোথা হতে অহঙ্কারে ফুলি'
এল বায়ু বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ অসি তুলি'।
অমনি উদার বক্ষ মেলি' দিয়া তা'র
বরষিল তপ্ত বুকে অমৃতের ধার।
তেমনি যখন রসে ভরে যায় প্রাণ,
জানি না কেমনে তারে করা যায় দান!
হেনকালে আসে যদি আবেগ-ঝটিকা,
হানে প্রাণে বেদনার বিদ্যুতের শিখা
অমনি সে বিগলিত প্রেমরসধারা
অবিরাম বহে, মোরে করে আত্মহারা।

জ্যোৎস্নারাত্রি

সহসা কেন ঘুমের পরশন
চক্ষে মোর লাগে?
সারাদিনের অশ্রুবরষণ
চিত্তে নাহি জাগে!
স্বপ্নে দেখা অস্ফুট স্মৃতি-প্রায়
অতীত ব্যথা কোথায় মিলে যায়!
আকাশ জুড়ি' পরাণ ভরি' আজ
উদয় নবরাগে!
সারাদিনের অশ্রুবরষণ
চিত্তে নাহি জাগে!

মগন দিক জোছনা সুমধুর,
তরল সুধাধারে
পরাণ ছাপি' হয়েছে ভরপুর—
রাখিতে নাহি পারে!
চাঁদের পাশে মেঘেরা চলে ছুটি'
সোহাগে করে আলোকে লুটোপুটি;
ধ্বনিয়া ফিরে সব নীরব গীত
আমার গৃহদ্বারে!
পরাণ ছাপি' হয়েছে ভরপুর—
রাখিতে নাহি পারে!

জগৎ মাঝে একাকী কে গো বসি',
এ কোন রাজবালা।
মাথার 'পরে জাগে শুক্লশশী,
হেরিছে মেঘমালা!
কোমল হাতে বীণার তারগুলি
যত্নে বেঁধে বক্ষে নেছে তুলি',
গুমরি তাই গাহিছে মৃদু তানে
রুদ্ধ কত জ্বালা!
মাথাব 'পরে জাগে শুক্লশশী।
হেরিছে মেঘমালা।

আমাব সাথে যেন গো পরিচয়
হয়েছে কতদিন!
আজিকে হেরি সে বাহুকিশলয়
বক্ষ 'পরে লীন।
বসন্তের মৃদুল বায়ুভরে
চমকি' তার অঙ্গ থরথরে;
পুলকে মোর কাঁপিয়া উঠে হিয়া
বাজিয়া উঠে বীণ!
আজিকে হেরি সে বাহুকিশলয়
বক্ষ 'পরে লীন।

সহসা যবে ভাঙিবে ঘুমঘোর
পাব না তার দেখা,
রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা।
নয়ন 'পরে রবে বিরহ লোর,
স্বপন যাবে, রহিবে শুধু ঘোর;
সঙ্গীহারা রহিবে হেথা পড়ি'
ছিন্ন বীণা একা।
রাঙিয়া রবে কেবলি বুকে মোর
কর-পরশ-রেখা।

রূপান্তর

বসন্ত-আবেগ-শ্রান্ত প্রান্তরের 'পরে
নীরবে নামিল সন্ধ্যা ; পুরবীর স্বরে
সকল মুখর ভাষা দিল মৌন করি'।
শান্ত বনচ্ছবি। চন্দ্র কিরণ-পাপড়ি
সহসা খুলিল নভে। স্বপ্নসম সব
ঘেরিয়া ধরিল মোরে নিবিড় নীরব!
জানি না তখন কার প্রেম আলিঙ্গনে
ছিলাম মগন ; তার নয়নেব কোণে
আমার সকল ব্যর্থ বিরহের তান
লভিল পুলকভরে চির অবসান।
প্রভাতে ভাঙিল ঘুম বিহঙ্গের গানে,
মেলিয়া নয়ন মোর হেরি উর্ধ্বপানে,
নবজাগরণে ভরি' আকাশের বুক,
সেই বাহু সুকোমল, সেই হাসিমুখ।

যাত্রা

রব দূরে, তবু নহে প্রবাস যাপন,
গৃহ হতে গৃহান্তবে কেবলি গমন।
হে বিশ্ব-গৃহের লক্ষ্মী! তোমার সংসার
পরিপূর্ণ জলে-স্থলে, নাহি অন্ত তার।
অসীম এ পারাবাবে বিম্বসম ভাসি,
কভু দুঃখে কেঁদে মরি, কভু সুখে হাসি।
তোমার মঙ্গল-রূপ সুখদুঃখ মাঝে,
সব ঠাঁই সব ক্ষণে নিয়ত বিরাজে।
তব শিশু নহে বদ্ধ অঞ্চলের ছায়।
উন্মুক্ত বিশ্বের পথ ; যেথা প্রাণ চায়
রয়েছে অবাধ গতি। তোমার এ দান,
সব বাঁধ টুটি' রবে চির পরিত্রাণ।
গৃহ হ'তে দীন নেত্রে বিদায়ের কালে
হে কল্যাণি! তব টীকা আঁকি দিও ভালে।

মিলন

শুনেছিনু রূপকথা, রাজবালা কবে কোন্ বনে
ঘুমন্ত নগরী মাঝে সুপ্ত ছিল কুসুমশয়নে।
ছিল যত তরুলতা, যেন বৃদ্ধ তাপসীর মত,
ঝড়ে রৌদ্রে সমভাবে ছিল সব মাথা করি নত।
হেনকালে কোথা হ'তে রাজপুত্র হারাইয়া পথ,
বনেতে প্রাসাদ হেরি', টানি অশ্ব থামাইয়া রথ,
পশিল বনের মাঝে। দেখে যেন হয়ে মন্ত্রাহত,
কে এ অরণ্যের মাঝে বসন্তের ফুলটির মত ?
থাকিতে নারিল যুবা ; আগ্রহে ধরিল তার কর,
শিহরি' উঠিল বালা ; বনেতে ধ্বনিল কুহুস্বর,
চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল ফুল, আনন্দেতে
লতা হেলে দোলে,
বনদেবী আসি' সেথা হাসিয়া পড়িল যেন ঢলে'।
মিলন হইল দোঁহে, বারতা হইল আগুয়ান্,
ভাসাইয়া দুই কূল প্রেমের নদীতে এল বান।
জগতের আদি হ'তে এইরূপ ঘটয়ে প্রমাদ
সাগরে মিলয়ে নদী বেগভরে, নাহি মানে বাঁধ।
তাহারা মিলিয়া দোঁহে, এমনি জাগায়ে তুলি ধরা,
দোঁহার জীবনপথ করিল গো সুবাসেতে ভরা।

দুইটি হৃদয়

একি এ লীলা প্রেমময়,
ভুবনশাখে জাগালে দুটি পুলকভরা কিশলয়।
তোমার ঊষা নয়ন পানে
চেয়েছে দোঁহে মুগ্ধ প্রাণে,
বাতাস তব বারতা বহি
দোঁহার প্রাণে কি যে কয় !
ডুবালে আজি কি রসধারে নবীন দু'টি কিশলয়।

বাঁধন নাহি টুটিবে ;
হৃদয় দু'টি মিলিয়া গিয়া কুসুম হ'য়ে ফুটিবে।
হৃদয়দেব ! পূজার তরে
গন্ধ তার পড়িবে ঝরে,
আপনা ভুলি সে দলগুলি
চরণতলে লুটিবে,
নবীন দু'টি হৃদয় যবে একটি ফুলে ফুটিবে।

অসীম স্নেহে ঢাকিয়ো।
ফুলের পাতে প্রেমের মধু গোপনে ভরে রাখিয়ো।
সুখের দিনে, দুখের রাতে,
মলয় বায়ে, ঝঞ্ঝাবাতে,
কিরণময় বীণার রবে
তোমারি পানে ডাকিয়ো।
প্রেমের মধু রাখিয়ো হৃদে ভরিয়া, তুমি রাখিয়ো।

শরতের গান

আজকে আমি ধর্‌ব তোমায়,
প্রাণ ভ'রে আজ বাস্‌ব ভালো,
ওগো, ছিন্ন মেঘের খেলার সাথী
মন-ভুলানো পূবের আলো।
ডুবিয়ে মাঠের এপার ওপার
এলরে আজ কিরণ জোয়ার।
বিরাম নাইকো পূবে হাওয়ার
ভাসছে মেঘের ধবল তরী ;
যেন রে কোন্ সফল মিলন
বাজায় শঙ্খ গগন ভরি'।
আজ আলো আর মাঠের সঙ্গে
পান্না-সোনার মাখামাখি,
ফুলের গন্ধে, গানের ছন্দে
বিশ্বে প্রাণে ডাকাডাকি!
ভরা ভাদ্রে জলেস্থলে,
নির্মল নীল আকাশতলে,
বর্ষা বিদায় অশ্রুজলে
পড়েছে আজ কি সান্ত্বনা।
কান্নাহাসি গলাগলি
হাওয়ায় করে আনাগোনা।
ধরব আমি, ধরব তোমায়,
প্রাণ ভ'রে আজ বাস্‌ব ভালো,
ওগো, ছিন্ন মেঘের খেলার সাথী,
মন-কাঁদানো পূবের আলো!

অবসর

কে বাজালে মোহন বাঁশি!
দুলিয়ে শাদা কাশের রাশি,
ছড়িয়ে দিল শুভ্র হাসি
শারদ নীলিমায়।
ধরার পরে কোমল চরণ
বুলিয়ে গেল সবুজ বরণ,
ক্ষেতভরা ধান লুটিয়ে বরণ
কর্‌ল তারি পায়।

পটে আঁকা গাঁয়ের বুকে
আলোছায়া পড়ল ঝুঁকে ;
উঠ্‌ল ফুটে সবার মুখে
হাসির কলকল।
আজ সকালে কলসি কাঁখে,
চেয়ে আধেক ঘোম্‌টা ফাঁকে,
সবুজ ঘেরা দীঘির বাঁকে
চল্‌ল স্নানের দল।

দীঘির জলটি শিউরে উঠে'
হাতের ঘায়ে পালায় ছুটে,
ফিরে ঘিরে চায়রে লুটে
নিতে সরমখানি।
কখন বা সে ছল্‌কে ভুলে
পড়ছে গিয়ে এলো চুলে,
কখন বা দুই বাহু তুলে
আঁচলটি লয় টানি'।

আলোর সোহাগ আন্‌তে কাড়ি',
আকাশে মেঘ দিচ্চে পাড়ি ;
ডানা মেলি' বকের সারি
যাচ্চে যেন উড়ে।
ভুরুর মত কৃষ্ণ রেখা
জলের' পরে যাচ্চে দেখা ;
আলোক-উজ্বল পথটি বাঁকা
ঐ দেখা যায় দূরে।

মেঘ ও জলের ঢেউয়ের মেলা,
এমনিতর কতই খেলা
খেল্‌ছে আজকে সকালবেলা
ঠিকানা তার নেই।
ছায়ার মায়ায়, আলোর নাচে,
আকাশজোড়া খেলার কাছে
মন হারিয়ে বসে আছে
সকল কাজের খেই।

প্রতীক্ষা

আছে ওগো আছে।
যা' আছে তা' লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে।
ইচ্ছে করে বাহির করে'
চাইতে মুখের পানে ;
নয়ন দু'টি করতে কাজল
সোহাগ তুলির টানে ;
গুন্‌গুনিয়ে মনের ব্যথা
শোনাতে তার কানে।
পারি না যে—সে কয় কেঁদে
সদাই আমার প্রাণে
আছে ওগো আছে।
যা' আছে তা লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে।
বধূরে মোর আনতে যে চাই
ভিতর হ'তে কাড়ি',
শাঁখ বাজিয়ে করবে বরণ
যতেক পুরনারী ;
কইব কথা গোপন কথা
মনের কথা তারই,
হায়রে সে কয় করুণ সুরে
মুছে নয়নবারি—
আছি ওগো আছি।
কইব কথা, এম্‌নি রব
হিয়ার কাছাকাছি !

জনশূন্য পথে যখন
বাহির হলেম সাঁঝে,
বনের ধারে জোনাক-জ্বালা
ঝিঁ ঝিঁ-ডাকার মাঝে ;
সাঁঝের সুরটি ফুটল যখন
তারার মোহন সাজে,
আমার হিয়ার তন্ত্রী তখন
গুমরে গুমরে বাজে-
আছে ওগো আছে !
বিরহের গান গাচ্ছে বসে
তোমার হিয়ার কাছে ।
বধূ আমার লুকিয়ে আছে
গোপন হৃদয়পুরে ;
কেমন করে নাব্‌ব সেথা
সে যে অনেক দূরে !
খুঁজে আমি পাই না তারে
মর্‌ছি মিছে ঘুরে !
শুনব কবে বাজ্‌বে যবে
বীণা মিলন সুরে—
আছি ওগো আছি !
আমার কণ্ঠে দাও পরায়ে
তোমার মালাগাছি ।

বর্ষশেষ

কর্ম-ক্লান্ত বৎসরের শেষ রশ্মি-শিখা
অস্ত গেল ! ঊর্ধ্বে হের কার অনামিকা
অঙ্গুলি ফিরিল আজি পূর্বাচল পানে ।
আজিকার বিদায়ের রাত্রি অবসানে
অতিথি আসিবে দ্বারে ! তারি তরে হিয়া
আকুল-বিস্ময়ভরে আছে প্রতীক্ষিয়া ।
সারা বিশ্বে অশ্রুঘেরা স্তব্ধ আয়োজন
শেষ অর্ঘ্য রচিবারে । ওগো পুরাতন ।
নিত্য নব নব রূপে তোমার প্রকাশ,
চিরন্তন লীলা, মাঝে নাহি অবকাশ,
তবু বিশ্ব মিলনের পূর্ণতার তরে
বিদায়ের অশ্রু ঢালে ঋতু সম্বৎসরে ।
সব শূন্য করে আমি রচি দিনু স্থান,
ব্যর্থ আশা জীবনের চরম সম্মান ।

নববর্ষ

কল্যাণের শুভস্পর্শে হোক্ সুপ্রভাত,
ভগ্ন হৃদয়ের দ্বারে পুণ্য-রশ্মি-পাত।
দীপ্ত নীলাম্বরে আজি পূর্ণ মহিমায়
প্লাবিয়া নিখিল বিশ্ব কি আনন্দ ভায়!
সারা বর্ষ খেলিয়াছি স্বপনের খেলা ;
যারে চাহি তারে শুধু করি অবহেলা।
সংশয় করিতে দূর জালে পড়ি' ধরা,
রুদ্ধ ঘরে ছিনু বসে অন্ধকারে ভরা।
দূর কর আজি প্রভু মায়া-কুহেলিকা!
জ্বালাও, জ্বালাও চিত্তে নব-দীপ-শিখা!
সব দ্বন্দ্ব ঘুচি' পথ হউক্ সবল,
মুক্ত কর, এ কঠিন স্বার্থের শিকল।
নব প্রাণ সঞ্চারিত হোক্ ধরাতলে,
ঝরুক্ অমৃত-ধারা তব জলেস্থলে!

বর্ষার গান

বাজেরে বাজে হিয়ার মাঝে
বাদল-ঝরা গান ;
মেঘের সাথে মিলেছে রাতে
সকল মনপ্রাণ।
শ্রাবণ ঘন, নিবিড় নিশা,
না হেরি পথ, না পাই দিশা,
জানি না আজি উঠেছে বাজি
কাহার আহ্বান!
হৃদয়-তীরে ধ্বনিয়া ফিরে
বাদল-ঝরা গান।

আপন মনে নিভৃত কোণে
জ্বালায়েছিনু বাতি ;
সহসা কেন নীপের শাখে
উঠিল বায়ু মাতি।
তখনি দীপ নিবায়ে দিয়া,
পরশ কার লভিল হিয়া।
দেখিনু যারে, বরিনু তারে
চিরজনম সাথী ;
সহসা কেন পিয়াল বনে
পবন উঠে মাতি!

আমার গান আঁধার প্রাণে
দুয়ার খুঁজি ফিরে,
পথ না পেয়ে, নয়ন বেয়ে
ঝরিছে আঁখি নীরে!

কাজল-কালো বেদনা টুটে
খনে খনে সে চমকি' উঠে,
অনল-ঝলা' বিজুলী-ফলা
হৃদয় চিরে চিরে।
আমার গান ফাটিয়া পড়ে
আকুল আঁখিনীরে!

কাহার তরে একেলা ঘরে
জাগিয়া রহে মন!
আকাশ পরে খুঁজিয়া মরে
কাহার দরশন!
পরাণ কার চরণ-পাতে
কাঁপিয়া উঠে গভীর রাতে?
কাহার ব্যথা বহিয়া আনে
বাদল-বরিষণ?
কাহার তরে একেলা ঘরে
জাগিয়া রহে মন?

শরৎ সভা

আজি এ প্রভাতে শরৎ সভায়
বিশ্বের ডাক পড়েছে,
তাই বুঝি নিরালায় বসি এই
সোনার মুকুট গড়েছে।
তারি আভা মোর নয়নের পরে
ধারাসম আজ পড়িতেছে ঝরে;
সে পরশমণি ধরণীর বুকে
সকলি যে সোণা করেছে।
শুনিতেছি তাই শরৎ-সভায়
বিশ্বের ডাক পড়েছে।

দিকে দিকে তাই পুবের বাতাস
বারতা বহিয়া ছুটেছে;
পথে যেতে সে যে শিউলি বনের
মর্ম্মের কথা লুটেছে।
শতদল মধু-লুব্ধ ভ্রমর
গুঞ্জন-রত পেয়েছে খবর
অমল হৃদয় মেলেছে কমল
ঘুমঘোর তার টুটেছে।
তাহারি আভাস বহিয়া পুবের
বাতাস আজিকে ছুটেছে।

মীড়ে ধীরে কভু গমকে গভীরে
আকাশের বীণা বাজে গো ;
তালে তালে তার নাচিছে বিশ্ব
আলোক ছায়ার সাজে গো।
শুনি তটিনীর মঞ্জীর রব
শ্যামল দু'কূল স্তব্ধ নীরব,
পুলকি উঠিছে পরাণ তাহাব
নয়নে কি হাসি বাজে গো।
মীড়ে ধীরে কভু গমকে গভীবে
আকাশের বীণা বাজে গো।

এসেছে আজি এ শরৎ সভায়
সকল বিশ্ব এসেছে,
বন্যার স্রোতে অযুত তরণী
নব আনন্দে ভেসেছে।
আকাশ ধরায় আজি কানাকানি,
প্রাণে প্রাণে আজ হলো জানাজানি,
তাই দোঁহে আজি এমন পূর্ণ
মিলনের হাসি হেসেছে।
শরৎ-সভায় এসেছে আজিকে
সকল বিশ্ব এসেছে।

অন্তরের ধন

ধরি ধরি করে, ছুটি আলেয়ার পানে,
যত যায় সরে, তত নিকটে সে টানে !
হেলায় দুর্গম পথ হয়ে যাই পার,
ত্বরিতে তরিয়া দুস্তর পারাবার !
ছুটিয়া চলেছে, তার নাহি শ্রান্তিলেশ,
আলেয়ার পানে রাখি আঁখি অনিমেষ।
সকলি আঁধার, শুধু এই আলোটুকু
মুমূর্ষুর প্রাণসম করে ধুকু ধুকু।
ঐটুকু আলো যদি কভু নিবে যায়,
গতি তার হয় স্তব্ধ, সকলি হারায়।
অনন্ত আলোকধারা অন্তরের মাঝে,
নিবাত নিষ্কম্প দীপ্ত সুচির বিরাজে,
ফিরে ছাখ্ ফিরে ছাখ্ তারি পানে মন,
সেই নিরন্তর চির জ্যোতি-প্রস্রবণ।

বাসনা

কণ্ঠ চাহে করিতে গান,
হৃদয় চাহে করিতে দান
কেবলি ভালবাসা।
নয়ন ফিরে দরশ মাগি,
বাহু সে শুধু পরশ লাগি
রেখেছে চির আশা।

চিত্ত যাচে পিপাসাতুর,
পদ-পরশ-রস মধুর,
শুধু ক্ষণেক তরে,
পরাণ চাহে পাত্রে তার
ভরিতে যেই সুরভিসার
অঙ্গ হতে ঝরে।

একটি শুধু যামিনী তরে,
সকলি মোর কাঁদিয়া মরে
চাহিয়া পথ পানে,
তন্দ্রাহীন নীরবতায়
আঁধার নিশি ডুবাতে চায়
শুধু একটি গানে।

একটু প্রেম, একটু মালা,
একটু তার দহন-জ্বালা
গভীর বেদনাব।
একটু শুধু জ্যোছনা-পাশ,
দখিন-বায়-দীর্ঘশ্বাস
চিত্তে আপনার!

এমনি প্রিয়া মধুর সাজে
নামিবে কবে এ হিয়া মাঝে,
চরণ ফেলি ধীরে।
অন্তহীন সে অভিসার
রচিবে কবে বিরাম তার
আমার এই তীরে!

গান

প্রভু, মুছাও আঁখিবারি,
কৃপাভিখারী তব দ্বারে!
ফিরায়োনা, রেখোনা আর এ
অন্ধ কারাগারে।
আজি আলোক উৎসবে
একি অলোক সৌরভে
ভাসিল ধরা, তব বিমল
অমৃত রসধারে!

শ্যামল তৃণে পুষ্পবনে
ফুটিল একি হাসি!
গগন জ্যোতিমগন হল
তিমির ঘন নাশি!
এ অন্তরে শূন্য ঘরে,
নিরাশা কেন কাঁদিয়া মরে;
আশার বাণী শুনাও, লহ
আঁধার পরপারে।

কবে

কবে সকল বাঁধন ছিঁড়ে তোমার
মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ জুড়াব!
কবে সকল ধূলা ঝেড়ে তোমার
চরণধূলা মাথায় পাব!
কবে আমার হিয়ার মাঝখানেতে,
তোমার আসন রাখ্‌ব পেতে।
কবে সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে
পরম প্রেমে প্রাণ পুরাব!
কবে আমার মনের আঁধার কোণে
উঠ্‌বে জ্বলে তোমার বাতি!
কবে মহানন্দে ডুবিয়ে দেবে
আমার দিবস, আমার রাতি!
কবে জীবনতরী তোমার কূলে
লাগ্‌বে গিয়ে চরণমূলে,
কবে পারের হিসাব চুকিয়ে দিয়ে
হাটের খেয়ার কূল ভিড়াব?

গান

বেহাগ

জাগ জাগরে, হের অন্তরে
হৃদিগগন মাঝে !
জাগ্রত অনন্ত প্রেম-
চন্দ্রমা বিরাজে !
লহরে চিত ভরিয়া
পড়ে অমৃত ঝরিয়া ;
সকল ভুলি, দুয়ার খুলি
এস মধুর সাজে !

ফুটিল একি মাধুরী
নিখিল রস-সবসে
চিত-মধুপ সুধা-লোলুপ
গুঞ্জরিল হরষে !
কাহার বীণাযন্ত্র
বাজায় প্রেমমন্ত্র,
অসীম নভ পূর্ণ করি
বাজে নীরবে বাজে

বেদনা

ব্যথা জাগে অন্তরে,
কোন আলোকের পরশ মাগি
অন্ধ হৃদয়-কন্দরে।
কোন প্রভাতের অরুণ হাসি
নয়নে মোর উঠবে ভাসি,
মিলিয়ে দিয়ে আঁধাররাশি
ঘুচাবে সব দ্বন্দ্বরে।

কোন প্রেমে আজ সাজ্‌ব গো !
কি চন্দনের গন্ধভরে
অঙ্গ আমার মাজ্‌ব গো
মোর তরী কোন স্রোতের টানে
ভেসে যাবে অকূল পানে ;
কোন বাতাসে বাজবে গানে
চিত্ত বাঁশীর রন্ধ্র রে !

অপরিচিত

কোন সাগরের জোয়ার আসে
কে জানে, কে জানে!
ভাসল তরী দূর আকাশে
কার পানে কার পানে!
বাদল ধারা কার সে প্রেমে,
কি গান গেয়ে আসে নেমে!
ফলে ফুলে হাসে ধরা
কার দানে, কার দানে!

কোন সুদূরে কোথায় সে তীর,
কোন খানে, কোন খানে?
মোর বাণী আজ সজল সমীর
কয় কানে, কয় কানে।
মোর নয়নের পলক ছেয়ে
অশ্রুধারা পড়ে বেয়ে,
কাহার বীণা বাজ্‌ল হোথা
কোন তানে, কোন তানে?

নিরাশের আশা

একটি গানে কইব প্রাণের কথা,
পারি না গো, তাও যে পারিনা!
একটি সুরে বাজ্‌বে মনের ব্যথা,
পারি না গো, তাও যে পারিনা।
একটি প্রাতে নবীন কুসুম তুলে
দিব ঢেলে ঐ চরণের মূলে
হৃদয়দলের সবগুলি দল খুলে,
পারি না গো, তাও যে পারিনা।

এমন আশা কে জাগাল মনে,
হারি না গো, তবুও হারি না।
নামে আঁধার কোন অশুভক্ষণে,
হারি না গো, তবুও হারি না।
তবু বীণায় বাঁধতে যে চাই সুর,
জাগে পরাণ বিরহবিধুর,
আভাস পেয়ে ধায় হৃদয় সুদূর,
হারি না যে, তবুও হারি না।

সঙ্কোচ

টোড়ি—ঝাঁপতাল

যদি এ মনে সঙ্গোপনে
শুনাও তব বাণী,
তবুও ঐ পুণ্য নাম
কেমনে মুখে আনি!
আসিবে যদি চরণ ফেলে
সকল বাধা দু'হাতে ঠেলে,
কেমনে প্রভু চরণ তবু হৃদয়ে লব টানি!
তোমার ঐ পুণ্য নাম কেমনে মুখে আনি!

কেবলি ভয়ে নিজেরে স্মরি,
দূরেতে সরে যাই;
নিয়ত মোরে অভয় দিতে
নিকটে এসো তাই!
যতই বলি নাহি যে কেহ,
ততই তব বাড়ে যে স্নেহ;
তোমারে যেই জানেনা, তারে আপনি
লহ জানি!
তোমার ঐ পুণ্য নাম কেমনে মুখে আনি!

পরিপূর্ণতার রূপ

সারাটি রজনী মোর নিদ্রা নাহি ছিল দু'নয়নে,
সুদূর প্রান্তর ব্যাপি, আমার এ নিভৃত শয়নে
পশেছিল জোছনার স্নিগ্ধ মৃদু পরশ কোমল,
হৃদিসরোবর মাঝে তারি প্রতিবিম্ব নিরমল
জাগায়ে তুলিল তাহে অপরূপ মূরতি মধুর!
ছিন্নতন্ত্রী বীণা মোর আজি কেন বিরহবিধুর
নিমেষে উঠিল বাজি! কতবার এসেছিল দ্বারে,
যুগযুগান্তের কথা এনেছিল বহি' ভারে ভারে;
কত সুখস্মৃতি তার, কত আশা কত জাগরণ;
চাহিনি ত ফিরে আমি, করি নাই তাহারে বরণ,
কহি নাই কোন কথা! সহসা কি পরিচয়ে আজি
মুখর এ হৃদি-তন্ত্রী শত রাগিণীতে উঠে বাজি?
সমুখে রয়েছে পড়ি শ্যামকান্ত ফল-পুষ্পে ভরা
চন্দ্রকিরণ-রসবিহ্বল মূরছিত ধরা!
আমি ত একেলা নহি! এরও আজ ব্যথা বাজে বুকে;
আজিকে সবার সাথে পরিচয় সব দুঃখে সুখে!
চিত্ত মোর কাঁদি কহে—এ রজনী আজিকে সফল!
চির-পরিপূর্ণতার হের এই রূপ সুবিমল!

আশা

কোথা জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই! কোথা অতল সলিল!
কোথা সেই চির-প্রেম-রস-ধারা পূত, অনাবিল!
বেলা যায়, বেলা যায়, এ গাগরী ভরিল না আজ!
দিনান্তে বসিয়া ভাবি, হলনা যে দিবসেব কাজ!
কলহাস্য-মুখরিত গ্রামপথে যাত্রী চলে যায়,
সে রব শ্রবণে পশি' চিত্তমাঝে করে হায় হায়!
অশ্রু-ঘেরা নয়নের একপ্রান্তে ফোটে তবু হাসি,
যাওয়া নাহি হ'ল তবু চিত্ত বলে 'যেতে ভালবাসি।'
আজিকার এ যামিনী সফল করিনু দীপ জ্বালি,
কাল দিবসের শেষে এ গাগরী নাহি রবে খালি;
কানায় কানায় ভরি' উছলি' পড়িবে রসধার!
ছাড়িতে চাহেনা মন এইটুকু গর্ব আপনার।
আজিকে এ অলঙ্কারে, এ বসনে ঢাকি দৈন্য লাজ,
আছি আশা ধরে কবে আসিবেন সে রাজাধিরাজ!

হৃদয়-স্বামী

ভিখারী কহে তোমারি দ্বারে
এসেছি কতদিন,
গেয়েছি কত দুখের গান
তবুও উদাসীন?
ধনী সে বলে কত না ধন
রেখেছি তোমা লাগি;
সঁপিব বলে দিবস-নিশি
রয়েছি আমি জাগি।
জ্ঞানী সে বলে খুঁজিয়া সারা
দেখা যে নাহি পাই;
যতই বলি হয়েছে শেষ—
অন্ত দেখি নাই!
ক্ষ্যাপা সে বলে আপনা-হারা
ঘুরিয়া পথে পথে,
কাঁদিয়া মরি, নিদয় তবু
আসেনা কোন মতে!
বধূ সে বলে, হে প্রিয়তম!
কেবলি আঁখিজলে
সিক্ত করি নীরবে আজ
গেঁথেছি ফুলদলে!
বাসর-নিশি পোহায়ে যায়,
আসিবে কবে নাথ!
গোপনে মনে কে বলে তারে—
'রয়েছি তব সাথ!'

সন্ধান

কেঁদে কেঁদে ফিরে গহনে গহনে প্রাণ,
খুঁজে হয় হারা, নাহি পায় সন্ধান।
উষার উদয়ে, নিশার তিমির তলে,
সুখের পুলকে, দুখের নয়ন জলে,
বন মর্মরে, নির্ঝর কলকলে
ধ্বনিত বিপুল তান,
তারি মাঝে শুধু ব্যাকুল পরাণ মোর
খুঁজে হয় সারা, নাহি পায় সন্ধান।

কার লাগি এই বিশ্বসভার দ্বারে
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে?
কত খেলা হল কত না পথের শেষে,
কত কাল ধরে ভ্রমিল কত না দেশে,
কখনো সেজেছে দীনদরিদ্র বেশে,
কখনো রতনহারে।
আলোকে আঁধারে ঘুরিতে ঘুরিতে শুধু
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে।

আপনারে খুঁজে কে আপনি দিশাহারা,
দূরে চলে যায়, চোখে বহে জলধারা।
জানেনা জানেনা নিখিল ভুবন মাঝে
তারি আপনার পরম আপন রাজে
বিশ্ববীণায় তাহারি বিরহ বাজে,
বিপুল গানের ধারা!
সকল দৃশ্যে, সব সঙ্গীত তালে
আপনারে খুঁজে কে হলরে আজ সারা!

নেহদং যদিদমুপাসতে

আঁখির দুয়ারে আলো আসি বলে
মোরে বরে' লও, বরে' লও,
অন্তর মোর তারে দেখি বলে
ওগো তুমি নও, তুমি নও!
হৃদয়-কবাট খুলে বায়ু বলে
মোরে স্থান দাও, স্থান দাও,
মন বলে 'দূত, প্রভুর আদেশ
শুধু বলে যাও, বলে যাও!'
সলিল বলিছে 'শীতল বক্ষে
এস ডুব দাও, ডুব দাও।'
চিত্ত কহিছে—রসের আধার
সে যে, তারে চাও তারে চাও
নীলিমা বলিছে গগন ছাইয়া
নেহারো রূপ অপার!
মনে বাজে বেণু অরূপের রূপ
সকল রূপের সার!
এমনি সকলে আসে যায় নিতি
বলে 'বরে' লও, বরে' লও।'
কারে চাহে মন নাহি জানে, বলে
—ওগো তুমি নও, তুমি নও।

স্বপ্রকাশ

আপন বসন্তরাগে যেথা তুমি পূর্ণ প্রস্ফুটিত,
সেথা নাহি দখিন পবন !
নিঃশব্দ বীণায় তব যেথা জাগে সমাপ্ত সঙ্গীত,
যেথা নাহি কাকলি কূজন !
অনন্ত মিলন সেথা, চিব ভালবাসা,
যেথা স্তব্ধ গুঞ্জরণ, নাহি যাওয়া আসা,
বিবহ দহন নাহি, নাহি লুব্ধ আশা,
নাহি স্বপ্ন, শুধু জাগরণ !

যেথা তব তন্দ্রাহীন আঁখি জাগে দিনরাত্রি পাবে,
সেথা নাহি ক্ষণ-চন্দ্রলেখা !
যেথা পদপ্রান্তে তব চিব-মেঘমুক্ত রক্ত-রাগ,
সেথা নাহি উষারুণ রেখা।
নাহি দীপ্তি ক্ষণিকের নাহি অন্ধকার,
চির তৃপ্তি, নাহি অতৃপ্তির হাহাকার।
আছে মুক্তি, নাহি সেথা বন্ধন-বিকাব ;
নাহি সঙ্গী, নই সেথা একা !

চিরপরিচিত

বঁধু
তোমার সাথে দেখা আমার
গ্রামেব পথে যেতে,
শিউলি বনের গন্ধে যেথায়
পবন উঠে মেতে !
কচি ঘাসেব বুকেব 'পরে
যেথায় শিশির-অশ্রু ঝরে,
সোনার ধানের শীর্ষ যেথায়
দুলচে ভরা ক্ষেতে ;
তোমার সাথে দেখা আমার
সেথায় পথে যেতে !

বঁধু
সকালবেলা সেথায় কত
খেলা তোমার সনে,
আলোর লুকোচুরী যেথা
আমলকীর বনে।
বাতাস যেথা পাতার 'পরে
নৃত্যঘোরে লুটিয়ে পড়ে,
ফুলের মধু ভ্রমর যেথা
লুঠ করে গোপনে ;
সকালবেলা সেথায় কত
খেলা তোমার সনে !

বঁধু
দিনের হাটে তোমায় আমায়
কতই বেচাকেনা!
শোধ হলনা এক কড়িও
রইল কেবল দেনা!
হবে না শোধ, হবে না যে
সেই বেদনা প্রাণে বাজে
চিরদিনের ঋণী বলে
রইনু তোমাব চেনা!
দিনেব হাটে তোমায় আমায়
কতই বেচাকেনা!

বঁধু
গোধুলির ঐ ধুসব ছবি
আঁকা যখন হবে,
সন্ধ্যাবেলা পারে যাবাব
সময় আছে যবে!
শেষ হবে সব বিকিকিনি
ঋণের পবে হব ঋণী
খেয়ার কড়ি আপনি দিয়ে
নায়ে তুলে লবে!
সন্ধ্যাবেলা পারে যাবার
সময় যখন হবে!

কে জাগে

মেলিয়াছে আঁখি প্রভাতের পাখী
গাহে বন্দনা গান!
পুষ্পিত শাখা উষারুণ মাখা
বিরচে অর্ঘ্যদান!
করুণ-ললিত রাগে
স্বর্ণ-বলয় শিঞ্জিত-বাহু
কে জাগে! কে জাগে!
আলোক ধারায় আজি কে দাঁড়ায়
আঁধারের পরপারে!
শুভ-পরশন রস-বরষণ
বিশ্বেব দ্বারে দ্বারে!
হেব ভৈরবী রাগে
শুভ-সিন্দুর-শোভিত ললাটে
কে জাগে। কে জাগে।
সুনীল বিথার অঞ্চল কার
অসীম শূন্যে লুটিয়া!
চরণ প্রান্তে আছে একান্তে
রক্ত কমল ফুটিয়া।
বিমল প্রভাতী রাগে
বিশ্বকমল করি টলমল
কে জাগে! কে জাগে!

মুক্তবন্ধ চেতনছন্দ
ভাসিছে মন্দ পবনে !
ঘুচায়ে দ্বন্দ্ব জাগে আনন্দ
বিশ্ব ভবনে ভবনে !
হের প্রশান্ত জাগে অনন্ত
সবার চিত্ত গগনে !
হের ভৈরব রাগে
আলোক আঁধার করি একাকার
কে জাগে ! কে জাগে

সান্ত্বনা

মোর মনপাখী গাহে থাকি থাকি
হোলো না, হোলো না, হোলো না !
ওগো বিহঙ্গ। মেলো মেলো আঁখি,
ও কথা বোলো না, বোলো না।
আকাশে চাহিয়া খুঁজিতেছ কারে,
যারে চাও সে যে পিঞ্জরদ্বারে,
এই গান গেয়ে ডেকে বল তারে
খোল খোল দ্বার, খোল না !
ওগো বিহঙ্গ ! মেলো মেলো আঁখি'
ও কথা বোলো না, বোলো না !

চিত্তবাঁশরী কাঁদিছে ফুকারি,
বাজে না, বাজে না, বাজে না।
আজি হের দ্বারে অতিথি ভিখারী,
কান্না সাজে না, সাজে না !

শুনাও তাহারে দু'টি সাধা গান,
যা আছে গোপনে, তারে কর দান,
তারপর হয় হোক্ অবসান
তাতে যেন মন লাজে না !
আজি হের দ্বারে অতিথি ভিখারী,
কান্না সাজে না, সাজে না !

প্রাণবঁধু হায় এসে চলে যায়
রয় না, রয় না, রয় না !
মিছে হায় হায়, ফাগুনের বায়
সদাই বয় না, বয় না !
এসেছে যে আজ তারে যেতে দাও,
নূতন সুরেতে বাঁশী পুরে নাও
যা করেছ দান, ভরে আছে তাও
অন্তরে, সে ত ক্ষয় না !
মিছে হায় হায়, ফাগুনের বায়
সদাই বয় না, বয় না !

চিত্তকমল আঁখি ছল ছল
ফোটে না, ফোটে না, ফোটে না !
চিরদিন অলি মধুকুতূহলী
জোটে না, জোটে না জোটে না।
আসে মধুমাস শুভ অবসর,
ফুলে পল্লবে মেলি অন্তর
যে বারতা বহি আনে পিকবর
চিরদিন তাহা রটে না।
চিরদিন অলি মধুকুতূহলী
জোটে না, জোটে না, জোটে না !

জ্যোৎস্না

নির্বাক অন্তর মোর উঠিছে শিহরি ;
স্থির মুগ্ধ ছ'নয়নে অশ্রু পড়ে ঝরি' !
এ যে সুধা গরলের অপূর্ব মিলন !
একি এ তাণ্ডব নৃত্য, একি আলোড়ন !
বিশ্বসিন্ধু বিমন্থিত উগারে গরল
ধরণীর দুঃখসুখ ; শুধু অচঞ্চল
জাগ্রত রয়েছে হের সুধাপাত্র হাতে
কোন শুভ্র দেবীমূর্তি স্নিগ্ধ মহিমাতে !
ঝরিতেছে ধারাসম জোছনা নির্ঝর
ব্যথিত এ বক্ষ মোর পুলক-জর্জর !
এমনি জননি, হও অন্তরে উদয়
পরিপূর্ণ সুধারসে সব হোক্ লয় !
লভি নিত্য চিত্তে তব অমৃত আস্বাদ—
কর আশীর্বাদ এই, কর আশীর্বাদ !

প্রেমের ভাষা

ভালোবাসো জানি তাহা, প্রাণ চাহে বল—'আহা
প্রেয়সি তোমারে ভালোবাসি !'
এই কথা প্রাণ ভরে শুনিতে দিওগো মোরে,
এ পরাণ চির উপবাসী !
সার্থক সে মালা গাঁথা মিলনের সুরে বাঁধা
বাজে যবে সাহানার তান,
বরষা ঘনায়ে আসে বিরহী নয়নে ভাসে
মল্লার-সজল অভিমান !
করুণ পূরবী রাগে ব্যাকুল বেদনা জাগে
পরিপূর্ণ বিদায়ের সুরে,
পূর্ণিমার আঁখি পাতে যামিনী মিলনে মাতে
বেহাগে সে গীত উঠে পুরে !
নদী সে বহিয়া যায় মিলনের বাসনায়
অন্তরে ধ্বনিত সারিগান,
সাগরের বক্ষে গিয়া পরজে গরজে হিয়া
তরঙ্গিত গীত দিনমান !
পুষ্পের পরাণ মাঝে বাতাসের বাঁশী বাজে
যখন সুরভি করে দান,
বৃক্ষপল্লব ছাপি উঠিতেছে কাঁপি কাঁপি
সুরে তার মর্মরিত প্রাণ।
তাই বলি—ওগো প্রিয় সাহানায় বেঁধে নিও
আমাদের মিলনের বাঁশী ;
ভালবাসো জানি তাহা, প্রাণ চাহে বল 'আহা
প্রেয়সি তোমারে ভালোবাসি।'

দুটি তার

বিশ্ব যন্ত্রে একটি মন্ত্রে
বাঁধা আছে দু'টি তার,
বাজিতেছে তার জীবনের সুর
মরণের ঝঙ্কার।
দুটিতে মিলিয়া বাজে এক গান
যুগে যুগে বাজে, নাহি অবসান
আদি ও অন্ত জুড়ি দিনমান
ধ্বনিত সে ওঙ্কার!
বাজিতেছে তায় জীবনের সুর
মরণের ঝঙ্কার!

জীবনের সুর ধেয়ে চলে যায়
মরণের ধায় পাছে,
মাঝে নাহি তার কোন ব্যবধান
একই টানে বাঁধা আছে।
দ্যুলোক ভূলোক গাহে সেই গীত
বিশ্বহৃদয়-নিঃস্পন্দিত
কত বিচিত্র সুর কম্পিত
একটি ছন্দে নাচে;
মাঝে তার নাহি কোন ব্যবধান
একই টানে বাঁধা আছে।

বিশ্বযন্ত্রে একটি মন্ত্রে
বাজিতেছে দু'টি তার,
জীবন মৃত্যু—আদি ও অন্ত,
তোলে এক ঝঙ্কার।
বাজিছে চন্দ্রতপনতারায়
বাজিছে আঁধারে আলোকধারায়
মুক্তির মাঝে বাঁধন কারায়
ধ্বনিত সে ওঙ্কার!
জীবন মৃত্যু—আদি ও অন্ত
তোলে এক ঝঙ্কার!

মানসী

হে মানসী মনপুরে আছ সবটুকু জুড়ে
তবু নাহি হেরি রূপ তব,
বাহির হইতে ছানি আনিতেছ বক্ষে টানি
রূপ রস গন্ধ নব নব।

আপনি দাও না ধরা তবু এই বসুন্ধরা
চরণে লুটিয়া পড়ে আসি,
কি মোহের ইন্দ্রধনু রচিল অরূপ তনু
মূরছিত তাহে রূপরাশি!

শ্রাবণে আকুল ঝড়ে কুন্তল লুটায়ে পড়ে
চমকে চাহনি বিজলীতে;
বরষার ধারে তার বিগলিত বেদনার
কি মুরতি নারি যে লখিতে।

শরতে সুনীল নভে শব্দহারা গীতরবে
জোছনার মূর্ছনা বাজে।
আলোতে ছায়াতে মেশা মদির স্বপ্নের নেশা
স্খলিত বিহ্বল তারি মাঝে।

বসন্তের আগমনে মঞ্জু গুঞ্জরিত বনে
কুসুমের পরাগ সৌরভে,
বকুল শাখার কোলে তোমার ঝুলন দোলে
পল্লব মর্মর কলরবে।

নিত্যনবীন রূপে এই মত চুপে চুপে
ভরিয়া উঠিছ তুমি মনে,
বিচিত্র সে গীতধারা পদতলে পথহারা
বিজড়িত নূপুর নিক্বণে!

মোর অন্তঃপুরে হেরি হৃদয়গগন ঘেরি
তারার আরতি শিখা জ্বলে,
সব মধুগন্ধ ভার নিঙাড়ি ঢালিছ সার
আমার এ চিত্ত-শতদলে।

সবখানে বিশ্বমাঝে বাহিরাও কত সাজে
তবু নাহি হেরি তব রূপ,
কেবল রয়েছে জানি ভরিয়া হৃদয়খানি
মানস-মূরতি অপরূপ!

সহজ শোভন

এই চামেলী ফুলের মত
সুধু সৌরভে মাখা ফুটে থাকা হোক্
মোর জীবনের ব্রত!
নাহিক ভাবনা কেন ফুটে আছে
আপনি পূর্ণ আপনার কাছে
প্রভাতের পানে আঁখি মেলিয়াছে
জ্যোতিঃসুধা পানে রত।

যেন অমনি শুভ্রতায়
আজি অনাবৃত করি হৃদয় আমার
দলগুলি খুলে যায়!
সরল সহজে আলোকে বাতাসে
শ্যামল স্নেহের বক্ষেব পাশে
সব বাধা টুটি আপনা প্রকাশে
সফল পূর্ণতায়!

যেন এমনি ধরণী পরে
ধীরে দিন অবসানে ক্ষীণ জীবনের
চ্যুতদলগুলি ঝরে!
যেন এ ক্ষণিক বাঁধনের ডোর
একে একে সব টুটে যায় মোর,
পরাণ অমৃতগন্ধবিভোর
মরণেরে লয় বরে'!

প্রকৃতির রূপ

প্রথম তোমার কোলে এসেছিনু যবে
হে মাতঃ প্রকৃতি ! অর্থহীন কলরবে
চেয়েছিনু মুখপানে কেন নাহি জানি
তুমিও শুনাতে মোরে অর্থহারা বাণী,
বিগলিত স্তন্যসুধা করাইতে পান
পরিপূর্ণ স্নেহের সে অযাচিত দান !
লভেছিনু ও অঞ্চলে একান্ত নির্ভর
ওই বক্ষ মাঝে চির অমৃত নির্ঝর।
যৌবনের দ্বারে আসি সহসা দাঁড়ালে,
পরিচিত স্নেহভরে দু'হাত বাড়ালে,
সেই মুখ, সেই হাসি আনিয়াছ সাথে
সেই অচঞ্চল দৃষ্টি তব আঁখিপাতে !
সেই তব অর্থশূন্য নিঃশব্দ সঙ্গীত
তোমার বিপুল যন্ত্রে আজিও ধ্বনিত !

নিরঞ্জন

কেবলি তোমার রূপের ছটায় যদি
থাকিতে আমার সম্মুখে নিরবধি,
ভেবে মরিতাম কোথায় তোমারে রাখি !
তৃষিত পরাণ চাহিত না কিছু আর
মরিত সে মহা লজ্জায় আপনার
গোপনে আঁধারে রহিত সে মুখ ঢাকি।

কেবলি যদি সে তোমার অসীম শক্তি
জাগাত পরাণে আমার সভয় ভক্তি,
তাহলে মোদের মিলন ঘটিত না যে।
রুদ্রদীপ্তি সাগরে হতেম হারা
স্তম্ভিত হিয়া পেত না কুলকিনারা,
আপন দৈন্যে ডুবিত অকুল মাঝে !

তোমার যন্ত্রে কাঁপায়ে তন্ত্রীরাজি
সরবে গভীর বাণী যদি উঠে বাজি
কে তবে তাহার মর্ম লইবে বুঝি ?
তোমার বীণার গভীর বিশ্বপ্লাবী
সে নীরব বাণী খুলিয়া গোপন চাবি
অন্তর মাঝে লভিবারে মরে খুঁজি।

হে নিরঞ্জন, আপনা গোপন করি
দিতেছ সকলি, লভি তাই প্রাণ ভরি,
কেমনে দিতেছ, কি যে দাও নাহি জানি।
হে শক্তিমান, আপন শক্তি হরি,
প্রেমময়, কি আনন্দ মূরতি ধরি
সরস হরষে ভরেছ ভুবনখানি।

শেষ রক্ষা

তোমার চিত্র আঁকতে গিয়ে
রঙ্ মাখিয়ে নিই তুলি,
একটি রঙে ডুবিয়ে নিতে
বারে বারে যাই ভুলি।
শেষ হয়ে যায় আঁকা যখন
হয় না দেখি মন্‌মত
তবু আমি নিপুণ শিল্পী
তোমার কাছে অন্তত।
তোমার কাব্য পড়ে যখন
আপন মনে মিল গাঁথি,
তোমার ভাবে তোমার ভাষায়
তোমার ছন্দে ইত্যাদি ;
একটা ছন্দে আট্‌কে পড়ি
লেখা যে শেষ হয় না তাই,
সেটা তুমিই সাঙ্গ কর
যশের ভাগটা আমিই পাই
তোমার সুরে মিল করে সুর
গাইতে চাই যে একসাথে,
সবগুলো গান হয় যে শেখা
গোল বাধে ঐ একটাতে।
গাই না তাইত মনের দুখে
শুন্‌চি কেবল তোমার গান,
তোমার সভায় স্থান তবু পাই
এইটুকুই যা আমার মান।
সাজাই যখন গৃহ আমার
তোমায় আনব পণ করে,
পুলক আমার জেগে উঠে,
গভীর আশা অন্তরে।
তোমার আসন পাতব কোথায়
এত যে সাজ সরঞ্জাম,
এত দিনেও হলো না তাই
পূর্ণ আমার মনস্কাম।
প্রাণপণে তাই যা করতে যাই
একটু কেবল রয় বাকি,
তুমিই বল সেটা আমার
অক্ষমতা—নয় ফাঁকি !
সে আশ্বাসে ভরেছে মন
কিছুতে হার মানবে না ;
কি সাধ আমার জান্‌ছ তুমি
আর ত কেহই জান্‌বে না।

ব্যর্থতার মান

তোমায় বলতে মনের কথা
রয়েছে মোর ব্যাকুলতা,
বল্‌তে না দাও, থাক্‌ সে গোপনে।
বঞ্চিত এই প্রাণের মাঝে
জাগে গভীর বেদনা যে
তাই জাগিয়ে রেখো মনের কোণে।

এ সুর আমার নয়ন নীরে
বাজ্‌তে চায় ঐ চরণ ঘিরে
বাজ্‌তে না দাও, থাক্‌ সে চরণতলে
রেখো তারে নীরব করে
সেইখানে ঐ ধূলার পরে
ডুবিয়ে তারে দাওগো নয়নজলে।

ব্যর্থতারই আগুন জ্বেলে
দেব আমার সকল ঢেলে,
ভস্মশেষে তাই জ্বালিয়ে রেখো।
আশা আমার দগ্ধ করে
শূন্য করে, রিক্ত করে
লজ্জাহরণ চরণছায়ে ঢেকো।

সার্থক দান

এ সংসারে সবার সাথে অনেক কথা কই,
একটি কথা আছে তোমার তরে।
নয়নপাতে নীরবে কত অশ্রুবোঝা বই
তোমার লাগি একটি ফোঁটা ঝরে
কত না সুরে গাহি যে কত গান
কত বেদনা, কত যে অভিমান,
তাহার মাঝে একটি সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজে
সে সুর শুধু তোমায় খুঁজে মরে।

আশার কত কুসুম মনে ফুটায়ে তুলি নিতি
একটি আছে তোমার পদতলে।
কত বাসনাপ্রদীপে মোর উজলি উঠে প্রীতি
একটি দীপে আরতি শিখা জ্বলে।
কত না রসে হৃদয় উঠে ভরি
প্রকাশে রূপে নব মূরতি ধরি,
একটি রূপ রাঙিয়া রহে সে যে তোমার রঙে
একটি মণি ললাটে শুধু ঝলে।

আঁধার পটে কত না তারা ফোটে নিবিড় রাতে
সেথায় একা তুমি জোছনাধারা,
আলো আঁধার মিলেছে যেথা উষার আঁখিপাতে
সেথায় তুমি জাগিছ শুকতারা।
কত ভাবনা নামে হৃদয়তীরে
একটি থাকে চরণ তব ঘিরে,
জাগরণে জাগিয়া ছোটে কর্মধারা কত
একটি হয়ে তোমাতে হয় হারা।

বিশ্বপ্রেম

তোমারে যেই রেখেছে দূরে
তাহারই দ্বারে
কত না রূপে এসেছ তুমি
ফিরেছ বারে বারে।
তুমি তো পূজা চাহনি নাথ
সবার পানে বাড়ালে হাত
তাহারি মাঝে নিতেছ দান
লুকায়ে আপনারে।

কেবলি যদি তোমারে প্রভু
করি নমস্কার
লহ না তাহা, লহ না, মুখ
ফিরাও বারে বার।
সবার সেবা রয়েছে যেথা
রেখেছ তুমি চরণ সেথা
তাহারি মাঝে করি প্রণাম
নিভৃত দেবতারে।

সুরের মিল

কে গো বাজায় নীরব পরশে,
সে যে হৃদয়বীণায় বাজে!
তারে তারে সুর ওঠে যে নেচে
ছোটে রক্তধারার মাঝে।
বিশ্বহৃদয়-স্পন্দনেরই তালে
অম্বরে যেই মৃদঙ্গ বাজালে
তারই তালে বাজাই যন্ত্র মোর
বারে বারে দেখি মিল্‌ছে না যে।

কোন রাগিণী কখন কে বাজায়
শুধ্‌ যন্ত্রে বাজে সে কি
কেমন করে কোন দিকে সে ধায়
কোথা রূপ্‌টি তাহার দেখি!
সেই সুরেরই ছায়াটি গোপনে
ছুটে এসে আঘাত করে মনে,
এখন আমি গাইতে চাই যে গান
ছায়ার মত আসে মিলে যায়।

কে বলে মন্‌ ভুলিয়ে রাখে গানে
সে যে গভীর বেদনা
সেই বেদনার কঠিন ঘায়ের তানে
কর যন্ত্র সাধনা।
অশ্রুজলের জোয়ার ব'য়ে যাবে,
তারই মাঝে সুরটি খুঁজে পাবে,
তখনই ঠিক ছন্দে সুরে তালে
নাচ্‌বে গানের লহর আমার প্রাণে।

অতিথি

মিশ্রবাহার

এসেছে অতিথি, দ্বারে এসেছে
ফুলে পল্লবে বর্ণে সুগন্ধে
সে যে ভুবনভুলানো হাসি হেসেছে।

সে যে মৃদু গুঞ্জনগীত গাহিয়া
এল নবীন তরণীখানি বাহিয়া
রহে তৃষিত নয়ন মম চাহিয়া,
আজি ভেসেছে, নিখিল ধরা ভেসেছে
একি আনন্দপ্লাবনে ভেসেছে।

আজি সরস দখিন-বায় পুলকে
প্রাণতরঙ্গ কম্পিত দ্যুলোকে
হের বাহিরিল চিত মম পলকে
ভালবেসেছে, তাহারে ভালবেসেছে
সেই ভুবন ভুলানো হাসি হেসেছে।

অন্তরের উৎসব

পরজ

জাগিছ তুমি সুনীল নভে
জাগিছ এই প্রান্তরে
তেমনি পরিপূর্ণরূপে
জাগহ জাগ অন্তরে।
বাহিরে তব রসের লীলা
সে স্রোতধার পূতসলিলা
দিবসনিশি তাহারি মাঝে
চিত্ত যেন সন্তরে।

ধরণী শুচিবসন পরি
বাহিরিল এ উৎসবে
উতলা বায়ে বেজেছে বাঁশী
লুটিয়া ফুলসৌরভে।
তাহারি ছায়া হৃদয়বনে
বিছায়ে দাও অতি গোপনে,
কর মুখর বীণার তার
তব পরশ মন্তরে।

ভক্ত

কীর্তন

কাঁদায়ে আর কেমনে তুমি
ফিরাবে তারে কোথা,
সকল সুখে দুঃখে সে যে
চরণে অবনতা!
টানিয়া কাছে আনিয়াছ যারে
এ ত্রিভুবন যে বাঁধা তার দ্বারে,
করেছে সে যে চরম আপনারে
নিখিল অনুগতা।

ভুলায়ে আর রাখিবে কত
অলঙ্কারে সাজে
আপনারে সে ভুলিবারে চাহে
সকল জনার মাঝে।
বিশ্বের মাঝে বিলাইয়া প্রাণ
খুঁজিয়া মরে সে আপনার দান
তোমার মাঝে চরম অবসান
গভীর নীরবতা।

বিশ্বদেবতা

গৃহের প্রাচীর রচি' তুলে ব্যবধান
বিপুল অসীম সাথে; আমার এ প্রাণ
আপনার মাঝে তৃপ্তি চায় লভিবারে
বিরলে বিজনে রহি'। সে বদ্ধ দুয়ারে
আসি ফিরে যায় কত তরঙ্গ আঘাত
কত দুঃখ বেদনার কত অশ্রুপাত।
এ বিশ্বের দেবতারে নিজ সিংহাসনে
অচল অটল করি রাখিতে গোপনে
কত না প্রয়াস তার! জাগে কত আশা
বাসনা অনলে জ্বলে দুরন্ত পিপাসা!
তবু গৃহদেবতার অক্ষুব্ধ বিহার
নিখিল বিশ্বের মাঝে; পরিপূর্ণতার
তিল বাধা নাহি, জাগে মুরতি অম্লান
বাহির অন্তর ঘেরি রাত্রিদিনমান।

সম্মিলন

যুগে যুগে আসে আর যায়,
মিলন, মিলন সে যে চায়,
আসে যায় আলোকে আঁধারে
মোর সুখ দুঃখে বেদনায়।

এসেছে সে মধু ঋতু সাথে
স্মিতহাসি লয়ে আঁখিপাতে ;
নিখিল চিত্ত ঘেরি তাই
উতলা পবন আজি মাতে।

এসেছে হিয়ার কিনারায়,
নূপুর বেজেছে পায় পায়,
মধুর হিন্দোল রাগিণীর
মুরতি চিত্তমাঝে ভায়।

এমনি সে নামে কত সাজে
ভূলোক দ্যুলোকে হিয়ামাঝে।
কত ছন্দে, কত নব রাগে
বাজে, সুমধুর বীণা বাজে।

সে যে আসে মোর কাছে ধেয়ে
শুধু মোর মুখপানে চেয়ে ;
শূন্যে কোথা সুদূরে কে জানে
যায় মিলনের গীত গেয়ে।

পবনে সুরভিটুকু তার
খুঁজে ফিরে অঙ্গ আমার ;
তাহার বীণার তারে তারে
বাজিতেছে আমার ঝঙ্কার।

ঝরে পাতা, ফোটে কিশলয়
ফুটে আর টুটে কুবলয়,
এরি মাঝে তারই আসাযাওয়া
নিত্য জাগরণ আর লয়।

আসে সে যে, যায় আর আসে,
চিরদিন মোরে ভালবাসে,
সবে বাঁধি মহা সম্মিলনে
আসে মোর মিলনের আশে।

দুয়ারে

সিন্ধু

বধূ এসেছে প্রিয়তম
খোলগো খোল দ্বার।
লজ্জা অবগুণ্ঠন
ঘুচাও এইবার।

মেলিও আজি নয়ন
রচিও নব শয়ন
কুসুম করি চয়ন
গাঁথিও ফুলহার।

নিভৃত বনমাঝে
তাহার বীণা বাজে
মৃদু পবনে রাজে
সুরভি উপহার।

তুমিও সখি দিও
সুধা বচন অমিয়
চিরজীবনপ্রিয়
লভিও আপনার।

বঁধু

সে যে আসে তার আশে
ভালবাসে প্রাণ যারে।
তারি লাগি আছে জাগি
অনুরাগী বঁধুয়ারে।

তারি তরে নিশিভোরে
প্রেমডোরে গাঁথে মালা
গাহে নিতি মধুগীতি
আনে প্রীতি ভারে ভারে।

বঁধু মাতে মধু রাতে
তারি সাথে কি মিলনে;
সে বিতানে বাঁশী তানে
কহে প্রাণে কি গোপনে।

হৃদিতলে কালো জলে
কত ছলে নামে ধীরে,
উতলা সে কি উছাসে
কলহাসে ঘিরে তারে।

নিবেদন

কীর্তন

ওগো ডাকার মত হয় না যে ডাকা
কথার বোঝা শুধুই ওঠে বেড়ে
হয়না যে মন চরণতলে রাখা
আমার সকল মলিন ধূলা ঝেড়ে।

তোমার রসে হয় না মাতোয়ারা
ব্যাকুল করে বয় না চোখে ধারা,
তোমার ডাকে দেয় না সে যে সাড়া
উঠছে না সে অলস শয়ন ছেড়ে।

ওগো পরাণবঁধু আছ পরাণ মাঝে
একান্তে সেই হেরব তোমায় কবে,
বুকভরা সেই বোধটি জাগে না যে
কেমন করে শূন্য পূর্ণ হবে!

আনন্দহীন হৃদয়নিকেতনে
বাজে না যে বাঁশী প্রেম বিহনে,
জাগে না সেই দৃষ্টি দু'নয়নে
অবাধে যায় অরূপ মূর্তি হেরে।

সুদূর

সুদূরের পানে নয়ন মেলিয়া চাই
স্বপনের মত কি রূপ নয়নে ভাসে!
কোন্ গীতরসে টুটিয়া বক্ষ তাই
কি যে বেদনার শতদল পরকাশে।
সকল ডুবায়ে জনম জনম গো
ভরিয়া আমার গোপন মরম গো,
সুদূরের ধন অন্তরতম গো
নিত্য নিত্য চিত্তে যেন বিলাসে।

সুদূরে কোথায় বেজেছে করুণ বাঁশী
হৃদয়যমুনা উজান বহিল তায়,
কূলে কূলে তার ভরি উঠে কলহাসি
মত্ত লহরী উদ্বেল জোছনায়।
আমার পরম চিত্তহরণ গো।
আমার মোহন স্নিগ্ধবরণ গো।
আমার জনম, আমার মরণ গো।
নিত্য জাগিছে সুদূর চিত্ত আকাশে।

সকল-ভোলার দেশ

অতল সাগর মাঝে আছে
সকল-ভোলার দেশ,
আদি অন্ত নাহিক,
সেথায় নাই বিধানের লেশ!
নানান্ দ্বারে দিচ্ছে হানা
অনেক শোনা, অনেক জানা
কত বারণ কতই মানা
নাহিক তাহার শেষ,
তার মাঝেতেই আছে গো সেই
সকল-ভোলার দেশ।

নাইকো সেথায় রাত্রি দিবা
নাইক আঁধার আলো
রূপ অরূপের ভেদ কিছু নাই
নাইকো সাদা কালো।
নানান্ দ্বারে আছে তাহার
রঙ্ বেরঙের কতই বাহার
কত চাওয়ার কত পাওয়ার
কত মন্দ ভালো;
সে দেশটিতে কোথাও কিন্তু
নাইকো আঁধার আলো।

হাসিকান্না সুখ ও দুঃখ
সেথায় একাকার,
আকার সেথা যায় না দেখা
নাইকো নিরাকার!
নানান্ দ্বারে আছে কত
বড় ছোট'র আকার শত
কেউবা উঁচু, কেউবা নত
কেউবা নির্বিকার;
সেথায় কিন্তু নাই ভেদাভেদ
সকল একাকার।

সকল যাত্রী চলেছে সেই
সকল-ভোলার দেশে,
কেউ গিয়েছে কেউ থেমেছে
দ্বারের কাছে এসে।
সন্ধান যে পেয়েছে তার
ভাব বা অভাব নাই কিছু আর,
আনন্দে তার নিত্য বিহার!
নয়ন অনিমেষে
হেরে সকল-দেখার অতীত
সকল-ভোলার দেশে!

মজার কথা

এ'ত বড় মজা ভাই
যারে পেয়েছি তারে চাই,
দেখি না যাহা, বলি তা' আছে
আছে যা, 'নাই, নাই'।
নিকটে যাহা রয়েছে জুড়ে,
তাহারি লাগি ভ্রমি সুদূরে,
যে গান কভু বাজে না সুরে
সে গানই শুধু গাই,
এ'ত বড় মজা ভাই।

এ'ত বড়ই মজা ভাই
আছে যা, তারে পাই ;
জানি যা আছে অতি গোপনে
দেখি তা সব ঠাঁই।
আমার বলে জেনেছি যাহা
শেষে যে দেখি সবার তাহা,
সবার যা তা আপনি পাওয়া,
দিই যা লভি তাই,
এ'ত বড়ই মজা ভাই।

এ'ত বড়ই মজা ভাই
নিজের নিজে চাই,
সবারে টানি নিজেব পানে
সবার পানে ধাই,
আপন কথা পরের কানে
শোনাতে মন ফোটে যে গানে
অজানা যেই তাহারে জানি,
জানি যা', জানি নাই ;
এ'ত বড়ই মজা ভাই।

গুহাহিতম্

রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা,
সেই গভীরের অতল মাঝে
কাহার যাওয়া আসা !

যেথা নাইকো ঢেউয়ের মেলা,
নাইকো আলোছায়ার খেলা ;
তবু নাইকো সেথা আঁধার ঘেরা
শূন্যতলে ভাসা !

ও সেই রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা !
প্রবল বায়ের ঝঞ্ঝা যত
সেথায় এসে থামে,
দুইটি তীরের মনের কথা
সেই দিকেতেই নামে।

সেথায় সকল গীতি এসে
একটি পরম সুরে মেশে,
সেথা নিরাশ হৃদয় অশ্রু মোছে
থাকে না তার আশা !
ও সেই রূপ অরূপের মাঝখানেতে
কে বেঁধেছে বাসা !

বর্ষশেষ

বেহাগ-দাদরা

বরষে বরষে জীবন পরশে
হরষে বেদনায়।
নিখিল ভুবন নন্দিত তারি
সঙ্গীতসুষমায়।
সুখে দুখে সে যে চির প্রণম্য,
অসীম সে, তবু নহে অগম্য,
সে প্রেমমূরতি হের সুরম্য
সুন্দর জোছনায়।

বিশ্বভুবনে শুন মন্ত্রিত
তাঁর বন্দনা গান,
সারা বরষের সকল ক্লান্তি
কোথা লভে অবসান
ঘেরিয়া অপার মহা জলধিরে
শত তরঙ্গ যায় আসে ফিরে,
স্থির ধ্রুবতারা জাগে সে তিমিরে
গম্ভীর মহিমায়।

বিরহী

কত জন্ম জন্মান্তর আছি ওই চরণের তলে ;
কত ব্যর্থ যামিনী যে গিয়েছে দরশকুতূহলে,
কত আশা জাগরণে উদয়ের প্রথম সোপানে
শুনিতে সে পদধ্বনি! চাহিবারে ঐ মুখপানে
কতবার মেলেছিল সজল কাতর দু'নয়ান,
শূন্য মনে ফিরেছিল, পায় নাই তোমার সন্ধান।
হে চিরবাঞ্ছিত মোর, খেলা নাহি হল সমাপন
আজিও আমার, নাথ! বিরহের নিশীথ যাপন
সঙ্গীহারা একাকিনী! শূন্য মাঝে হৃদয় আমার
আর্তকণ্ঠে যাচে শুধু একবিন্দু বারি করুণার
চাতকের মত! শুধু চিরদিন জীবনের ফুল
ভাসিছে স্রোতের টানে, লভে নাই চরণের মূল!
কত না আবর্তমাঝে ঘুরে মরে, নাহি তার শেষ
অকূলের কূল কোথা ভেবে মরে, না পায় উদ্দেশ।

দরিদ্রের ধন

এ পাপের বোঝা, শত জনমেব কলুষের কালী
নামিবে, ঘুচিবে কবে নাহি জানি! করে দিবে জ্বালি
এ বিশ্ব মন্দিরে মোর অতি মৃদু দীপশিখাখানি!
লজ্জা যদি দেয় মোরে, তবু তারে অতি ক্ষুদ্র মানি
এক প্রান্তে রেখো ফেলে! দেখা যদি নাহি পাই তবু
এই আলো বক্ষে ল'য়ে রব জাগি জন্ম জন্ম প্রভু।
ঈষৎ কম্পিত এক অতি ক্ষীণ আলোকেব বেখা
তা'লয়ে ভ্রমিব পথে, একটু আভাসে শুধু দেখা
যদি পাই, তাই ভাল! দীপ্তি আমি নাহি চাহি নাথ,
পরিপূর্ণ প্রাণ লয়ে করিতে চাহিগো প্রণিপাত
একান্ত ভকতিভরে। বিশ্ব যদি হয়গো বিমুখ,
বিশ্বদেবতার পানে নিত্য চাহি রহিবে উৎসুক
উন্মুখ এ দীপশিখা। কর জাগ্রত এ চেতনা
'হোলো না হোলো না কিছু' এ জানার গভীর বেদনা।

বরষা আবাহন

বনে বনান্তে দিকে দিগন্তে
এস হে নিবিড় এস হে!
হৃদয়-ভবানো জীবন-জুড়ানো
এস সুগভীর এস হে!
এস পবিত্র, এস নিরমল,
এস তাপহর, এস সুশীতল,
অশণিমন্দ্রে এস মহাবল,
ঘোব গম্ভীর এস হে!

তৃষিত শুষ্ক তপ্ত ধুলায়
পরাণ বরষি এস হে!
বিদ্যুত-জ্বালা চকিতে জ্বালায়ে
ভীষণ হরষে এস হে!
এস ঝরঝর সজল ছন্দে
এস ধরণীর আর্দ্র গন্ধে,
এস নবঘন—ঘন আনন্দে,
পুলক-অধীর এস হে!

করুণ কঠোর

প্রলয় মূর্ত্তি ধরিয়া এসেছে দুয়ারে ;
রুদ্র, ভীষণ, নমি বার বার তোমারে।
ধূর্জটি, তব জটাজাল উড়ে গগনে,
মাতে উন্মাদ নৃত্য ঝঞ্ঝাপবনে,
ললাটনেত্র চমকে আঁধার ভেদিয়া ;
হে ঈশান, তব প্রলয়-বিষাণ ফুকারে।
রুদ্র, ভীষণ, নমি বার বার তোমারে।

হে নিঠুর, এলে করুণ মুরতি ধরিয়া,
সব তাপদাহ নিমেষে লইলে হরিয়া।
ঝরিছে তোমার বেদনা বরষাপ্লাবনে,
রুদ্ধ দুয়ারে করিছ আঘাত সঘনে,
মধুরে ভীষণে মিলন নেহারি অপরূপ ;
প্রলয়, সৃজন, নাচিছে বিশ্বপাথারে ;
রুদ্র, দয়াল, নমি বার বার তোমারে।

অম্বর ঘেরি ডম্বরু তব বাজে হে,
এস হে, ভিখারী, এস মঙ্গল সাজে হে।
এমনি ধূলায় ধূসর করিয়া লহ গো,
আদেশ তোমার বজ্রের রবে কহ গো।
দগ্ধ করিয়া সকল অশিব সংশয়
রিক্ত করিয়া করহে পূর্ণ আমারে।
হে শিব, কঠোর, নমি বার বার
তোমারে।

ব্যর্থতা

শুধু এই সব, এই সব ?
আপনার কানে শুনিব কি বসে
আপনারি কলরব ?
শুধু ভুলে থাকি আপনার সুখে
আপন বেদনা সহি সদা বুকে
শূন্য বাক্য কহি নিজ মুখে
পূর্ণতা অনুভব !
এই সব, এই সব ?

শুধু এই খেলা খেলে সবে
আপনার পিছে ছুটি কি গো কভু
আপনারে ফিরে পাবে ?
সকলের মাঝে প্রবেশের দ্বার
বন্ধ করিয়া ভাবে বার বার
এই তো পূর্ণ হয়েছে আগার
সবই আছে, কিবা চাবে !
এই খেলা খেলে সবে ?

শুধু কেবলি এ জটিলতা
পথে পথে মোর বাঁধা আছে পায়
বলে মোরে যাবে কোথা।
যে মালা কণ্ঠে পরাইতে চায়
চোরা কাঁটা তার শুধু বিঁধে গায়,
কারে চাহি মন দু' হাত বাড়ায়
কি লাগি চঞ্চলতা!
কেবলি এ জটিলতা।

শুধু এই সব, এই সব ?
সকল ডুবায়ে শুনিব বিশ্বে
আপন কণ্ঠরব ?
আপনার সুখ, আপনার দুখ
সবা হ'তে মোরে করিবে বিমুখ ?
হবে না চিত্তে কভু জাগরূক
বিপুল সে অনুভব ?
এই সব, এই সব ?

অচেনা

গানে দেব কোন সুর লয়
বাঁধব কেমন ছন্দে
ভরে দেব কোন দেবালয়
কোন কুসুমের গন্ধে ।

একলা বসে সুখে দুখে
রইব চেয়ে কাহার মুখে ;
মাতিয়ে নেব শয়ন আমার
কোন পুলক আনন্দে !

কোন বেদনায় বাজবে আমার
হৃদয়-বীণার তন্ত্রী
কোন পরশে বাজ্‌বে সে তার
কে হবে তার যন্ত্রী ।

সাগর আমার কুলে কুলে
কোন জোয়ারে উঠবে দুলে ;
মরবে আমার নিশীথ রাত্রি
কোন্ সুধাময় চন্দ্রে ।

দিনেন্দ্রনাথের শেষ কয়েকটি দিন

অমিতা ঠাকুর

আট নয় বছর বয়সে মা ঠাকুমা ভাই বোন সকলকে ছেড়ে সদ্য পিতৃবিয়োগের অসহায়তা নিয়ে যখন শান্তিনিকেতনে যাই তখন এক মুহূর্তে সব অপরিচয়ের বাধা সরিয়ে যিনি পরম স্নেহে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তিনি দিনেন্দ্রনাথ। মস্ত একটা আশ্রয় পেলাম যেন। এত বড় বিরাট পুরুষের অন্তঃকরণ ছিল শিশুর মতো। শিশুদের জন্য এমন ভালবাসা আমি কারো দেখিনি। শিশুরা ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে অভিনয় ব্যাপারে কিছু শেখাচ্ছেন বা সংশোধন করে দিচ্ছেন এমন কখনও দেখা যায় নি। ওঁর সঙ্গে অভিনয় করে দেখেছি কি সহজ ও স্বাভাবিক ছিল ওঁর অভিনয়। যাঁদের শেখাবার দয়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজে নিতেন তাঁদের ছাড়া বাকি সকলকেই দিনেন্দ্রনাথের হাতে তৈরি হতে হত। তপতী অভিনয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ রাণী সুমিত্রার অংশে মনোমত কাউকে না পেয়ে বন্ধ করে দেওয়া মনস্থ করলেন তখন দিনেন্দ্রনাথই বললেন "অমিতাকে ডেকে পাঠাও পারলে ও-ই পারবে।" রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজি হন নি, বলেছিলেন "ওসব ভালমানুষের কম্মো নয়, জোর চাই জোর, তেজ চাই। তবুও দিনেন্দ্রনাথ বারংবার বলতে লাগলেন পারলে ও-ই পারবে, তুমি দেখই না।" আসলে ছাত্রছাত্রীদের উনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভাল করে বুঝতেন জানতেন, কে কি পারে না পারে।

ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতচর্চার যে পরিবেশ ছিল তার প্রভাব দিনেন্দ্রনাথের উপর সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়েছিল। রাগসঙ্গীত ভাল করে শিখলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই একেবারে প্রাণের নিজস্ব ধন করে নিয়েছিলেন বলেই তার পরিবেশনায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। বারবার গেয়ে পরম ধৈর্যের সঙ্গে শেখাতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না গলায় গানটা বসছে। তাঁর শেখানো যেমন সহজ তেমনই স্বচ্ছন্দ ছিল তার গতি। সমস্ত আশ্রমময় তিনি গান ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যখন তখন ছেলেমেয়েরা প্রাণের আনন্দে গান গেয়ে উঠত। তারা না ঘুমোনো পর্যন্ত গানে ভরে থাকত আশ্রম। বর্ষা নামলে অধিকাংশ ক্লাস বন্ধ হয়ে যেত, তখন কোথাও বসে যেতেন দিনেন্দ্রনাথ তার দলবল নিয়ে। দেখতে দেখতে গান জমে উঠত। বর্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাঁদনী রাতেও খোলা মাঠে বসে গান শুরু হয়ে যেত।

কোনভাবেই একা থাকার মানুষ ছিলেন না। দলবল ছাড়া তাঁর চলত না। বাড়িতে থাকলে বসত চায়ের আসর। দেহলী বাড়ির বাগানে ও সুরপুরীতে বিরাট একটা তক্তপোষ পাতা থাকত, যার উপর চায়ের আসর জাঁকিয়ে বসত। পুরানো লাইব্রেরীর উপরের লম্বা বড় ঘরে চীনদেশের

রবীন্দ্রনাথের দোভাষী সু-সী-ম-এর স্মরণে চীনে-চায়ের অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান 'চাস্পৃহ চঞ্চল' এই উপলক্ষে লেখা। নন্দবাবু আমায় চীনে মেয়ে সাজিয়ে এই গানের সঙ্গে চা পরিবেশন করালেন। এর পরই দিনেন্দ্রনাথ সুরপুরীর বাড়িতে উঠে যান। ওঁর এই চা-চক্রের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি গৃহ নির্মাণের জন্য পত্নী কমলা দেবী টাকা দেন ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সাহায্যে 'দিনান্তিকা' নামে চা-চক্রের স্থায়ী ঘরটি নির্মিত হয়। সুরপুরীতেই দিনেন্দ্রনাথের নিজের লেখা গান শুনেছি, শিখেছি।

"পথ পাশে মোর রচিনু দেউল
পথিক নিতুই আসে যায়
কেহ আনন্দে হাসিয়া আকুল
কেহ মূর্ছিত বেদনায়।"

"পলাশ রাঙা বাসনাগুলি মনের কোণে বিছায়ে
আজিকে যত কর্ম ভুলি আসিনু তারি নিছায়ে"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুবই মিল থাকলেও দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার ছোঁয়াও আছে মনে হয়। লিখতেন আর ছিঁড়ে ফেলতেন, তবু যা বেঁচেছিল তাই নিয়ে মৃত্যুর পর কমলা দেবী দিনেন্দ্ররচনাবলী ছাপালেন। ওঁর অনুরাগী ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধাঞ্জলিও এতে আছে।

যে দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের উৎসবরাজ ছিলেন, যে দিনেন্দ্রনাথের কারণে-অকারণে ডাক পড়ত গুরুদেবের দরবারে, সেই দিনেন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালে চলে এলেন কলকাতায়। বম্বেতে রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশের দল নিয়ে গেলেন—সেখানে দিনেন্দ্রের উপর গানের ভার বরাবরের মতই। সেই শেষ তাঁর শান্তিনিকেতনের গানের ও অভিনয়ের দলের সঙ্গে যোগ। ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রি করে সামান্য কয়েকটি ছোটখাটো ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে চলে এলেন কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে। স্ত্রীও বুঝতে পারেন নি এভাবে তাঁরও জিনিসপত্র সব বিক্রি করে চলে আসবেন। একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন কমলা দেবী। কাউকে মন খুলে এ বিষয় নিয়ে কিছু বলেন নি দিনেন্দ্রনাথ শুধু জানা গিয়েছিল যখন বিশ্বভারতী থেকে চারু ভট্টাচার্য মশায় টাকার প্রস্তাব নিয়ে দিনেন্দ্রনাথের কাছে এলেন উনি তখন চারুবাবুকে বলেছিলেন "ওরা আপনাকে পাঠিয়েছে, আপনি নূতন মানুষ, নিজেরা কেউ এ প্রস্তাব নিয়ে আসবার সাহস রাখেনি, তাই। এতকাল বিদ্যালয়ের সেবা করে এখন আমি মাইনে নেব বিশ্বভারতীর কাছ থেকে?" খুবই রেগে গিয়েছিলেন এ প্রস্তাবে। অত্যন্ত অপমানিতও বোধ করেছিলেন।

টাকার জন্য শুধু দিনেন্দ্রনাথই নয় দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবারের সকলের খুবই কষ্ট গেছে। জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে বঞ্চিত হয়ে মনে দারুণ কষ্ট হয়েছিল দেখেছি। আমাদের কাছেই একদিন দুঃখ করে একথা বলেছিলেন যে জোড়াসাঁকো বাড়িতে তাঁর কোনো অধিকার নেই। তাঁর মুখে তাঁর এই ক্ষোভের কথা শুনে আমরা খুব রেগে গিয়েছিলাম। আসলে তার পিতাই ঐ বাড়ির অংশ ছেড়ে দিয়ে একলক্ষ টাকা দাবী করেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে মারা গেলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্য দুই

ভাইয়ের তরফ বললেন নগদ অত টাকা তো দেওয়া যাবে না তাই তার সুদ ৫০০ টাকা না ৬০০ টাকা বছরে দেওয়া হবে। তাছাড়া দশহাজার টাকা দিয়ে সুরপুরীর বাড়ি দাদামশায় (দ্বিজেন্দ্রনাথ) কিনে দেন। সে টাকা দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্যান্য ছেলেদের মাসে মাসে দিতে হয়েছে। আশ্চর্য এই সে বাড়িজমির কোনো দলিল ছিল না। সব কেনা বেচাই মুখে মুখে হয়েছিল ভাইদের সঙ্গে। যেজন্য পরবর্তীকালে ২২ বিঘে জমির কিছুই ছিল না শুধু বাড়িটা ও বেড়া দিয়ে বাগান ঘেরা ছিল তাইই পেলেন। কমলা দেবী শেষে নতুন করে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন, তখন দিনেন্দ্রনাথ গত হয়েছেন।

দিনেন্দ্রনাথ বছরে ঐ টাকা নিয়ে গরমের সময় পাহাড়ে যেতেন। গরম সহ্য করতে পারতেন না একেবারে। ঐ সালে কোথাও যেতে পারলেন না টাকার অভাবে। আমাদের কাছে বললেন "রথিদের কিছু আটকাচ্ছে না, আমি গরম সইতে পারি না তাই প্রতি বছর পাহাড়ে যাই সেইটুকু পাবনা যেতে।"

অনেকে জানতে চান কেন তিনি শান্তিনিকেতন থেকে চলে এলেন। এটা সত্যিই খুবই আশ্চর্যের কথা। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না দিনেন্দ্রনাথ খুব মানী এবং অভিমানী স্বভাবের ছিলেন। অনেক সময় তাঁর এমন কতকগুলো বিষয়ে অভিমান দেখেছি যা সত্যিই ছেলেমানুষীর চরম। কাজেই ক্রমশই যখন অনুভব করলেন যে তাঁকে যেন আর প্রয়োজন নেই তেমন তখন স্বভাবতই তাঁর মনের গভীরে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছিল। শেষের দিকে তেমন কেউ যেতেনও না। সন্ধ্যেবেলা তো একেবারে একা বসে থাকতেন। কমলা দেবী গাড়ি পাঠিয়ে আমায় খুঁজে নিয়ে আসতেন দিনেন্দ্রনাথকে সঙ্গ দেবার জন্যে। এসে দেখতাম চুপ করে বসে আছেন গম্ভীর হয়ে। তারপর কথা বলতে বলতেই সে ভাবটা কেটে যেতে দেরী হত না।

অনেক গল্প শুরু করে দিতেন। রাত্রে নটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়তেন। যে মানুষটা মানুষের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারতেন না তাঁর পক্ষে এটা কত কষ্টের হয়ে উঠেছিল তাতো সহজেই বোঝা যায়। তারপর এটার তো কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না কেন গীতবিতান প্রকাশিত হল অথচ দিনেন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ পর্যন্ত রইল না। অথচ এই গীতবিতানের সঙ্কলন-পর্বে রবীন্দ্রনাথের দিনেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিখানা পড়লে বোঝ যায় বরাবরের মতোই রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথের উপর নির্ভরশীল। গীতবিতানে—যাতে সমস্ত গান একত্রে সঙ্কলিত হচ্ছে তা কত দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং সুধীর কর মহাশয়ের লেখা চিঠি থেকেও বোঝা যায় দিনেন্দ্রনাথের সহযোগিতাতেই সব হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কি হল? এর বিষয় একটি কথাও দিনেন্দ্রনাথের মুখে শুনিনি, এটাই আশ্চর্য লাগে। এরকম অবহেলা ও অনাদরের কথা নিজ মুখে প্রকাশ করাও তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক ছিল বুঝতে পারি। তাই বোধহয় সমস্ত অপমান বেদনা নিজের মধ্যে চেপে রেখেছিলেন।

এদিকে জমিদারি থেকে দ্বিজেন্দ্র পরিবারের প্রাপ্য টাকাও অন্যদের (ভাইদের) যখন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তখন শুধু দিনেন্দ্রনাথকেই তাঁর প্রাপ্য মাসহারা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বছরের এককালীন যতদূর মনে হয় ৫০০ কি ৬০০ টাকা বন্ধ ছিল। তারপর প্রস্তাব এল বিশ্বভারতীর

কাছ থেকে তাতেই উনি একেবারে ফেটে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালে গিয়ে বাড়ি বন্ধ করে জিনিসপত্র বিক্রি করে চলে এলেন শান্তিনিকেতন থেকে বরাবরের মতো। প্রশ্ন জাগে সে সিদ্ধান্ত কি নিলেন যখন দেখলেন ১৯৩৪ সালে নাটোরের বাড়িতে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে যখন তিনি সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধক তখনও রবিদাদা তাঁকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতে ডাকলেন না।

জোড়াসাঁকোয় এসে বিচিত্রা ভবনে ভাড়া দিয়ে রইলেন শুনেছি, এ-সব বিষয় উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করেন নি আমাদের কারো কাছে। আমায় শুধু একদিন বলেছিলেন, "আসল কথা কি জানিস খোকাকে (আমার ছেলে হাবলু) ছেড়ে আমার থাকতে ভালো লাগে না।" কিন্তু ওটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। শান্তিনিকেতনে থেকে সেখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ ও সকল মানুষজনকে নিয়ে তাঁর রবিদাদার কাজে ও সান্নিধ্যে তিনি যে আনন্দ পেতেন এমন আর কিছুতে নয়।

আগেই বলেছি জোড়াসাঁকোয় তো চলে এলেন ১৯৩৫ সালে একেবারে, শান্তিনিকেতনের পাট চুকিয়ে। যে কয় মাস জীবিত ছিলেন একটি দিনের জন্য ওঁর মুখে ক্ষোভ, দুঃখ বা এতটুকু বেদনার কথা বা প্রকাশ কথাচ্ছলেও শুনিনি বা দেখিনি। এখন বুঝি ওঁর স্বভাবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। রোজ দুপুরে বিশ্রামের পর তাসের আড্ডা বসাতেন। জোড়াসাঁকোয় তখন খেলুড়ে লোক কোথায়? টেলিফোন করে এবাড়ি ওবাড়ি থেকে একে ওকে ডাকতেন তাস খেলার জন্যে। লোক কম পড়লে আমাকেও জোর করে বসিয়ে দিতেন। তারপর বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরোতেন কোনো কোনোদিন আমাদের হোটেলে খাওয়াতেন কিম্বা সিনেমা দেখাতেন। ভাইদের নিয়েও যেতেন। ওঁকে মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় কখনো দেখিনি। অথচ অনেকের ধারণা উনি শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার পর কলকাতায় থাকাকালীন এমন মদ খেতেন যে তাতেই মারা গেলেন। সকালের দিকে ওঁর গান সংক্রান্ত ব্যাপারে কেউ না কেউ আসতেন—গান শেখাতেন। পাঁচ নম্বর বাড়ি থেকে ছেলে-পিলেরা এসে খেলা ধুলা হৈচৈ করত যা ওঁর চিরকালের প্রিয় ছিল। এই ভাবেই কাটছিল। একদিন সায়গল এলেন—অনেক গান শোনালেন। তখন 'প্রেমনগরসে' সায়গলের গাওয়া গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সকলের অনুরোধে সেটিও গাইলেন। দিনেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁকে কিছু গাইতে অনুরোধ করেননি।

পাঁচ নম্বর বাড়ির তেতলায় বড় জানলায় গগনেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়াতেন আর লাল বাড়ির (বিচিত্রা) বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিনেন্দ্রনাথ কথা বলতেন, গগনেন্দ্রনাথ তাঁর সুমধুর হাসিতে মুখটি উজ্জ্বল করে ঘাড় নেড়ে নেড়ে উত্তর দিতেন। তাঁর তখন কথা বলার শক্তি চলে গেছে স্ট্রোক হয়ে।

একদিন দিনেন্দ্রনাথ বললেন, "গগনকাকাকে দেখি আর আমার এত কষ্ট হয় যে কি বলব। আমি তো ভগবানের কাছে কখনও কিছু চাইনি—আমার তাঁর কাছে একটিই প্রার্থনা যেন পড়ি আর মরি।" ক'দিনই বা গেল তারপরে। ভগবান যেন তাঁর কথাই শুনলেন।

দিনেন্দ্রের উপর অভিমান করে বেশ কিছুদিন যাইনি ওঁর কাছে—অথচ একই বাড়িতে আছি। মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় ওঁর ভৃত্য এসে খবর দিল। "দিদিমণি এসেছেন আপনাকে ডাকছেন।"

দিদিমণি বলতে দিনেন্দ্র-ভগিনী নলিনী দেবী। এই খবর শুনেই বিচিত্রা বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি দিনেন্দ্রনাথ বারান্দায় একলাটি বসে আছেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে বললেন 'নলিনী ওবাড়িতে গেছে দেখা করতে'। আমি ওঁর সামনে বারান্দার রেলিং-এর নীচে চওড়া ধারিতে বসলাম। হঠাৎ অতদিন পর আমায় পেয়ে কি যে খুশি হয়ে উঠলেন—যত গল্প শুরু হয়ে গেল। সেই কতদিন আগে বদরিকাশ্রমে ও কেদারনাথ গিয়েছিলেন, সেই সব গল্প—পথের দুর্গমতা—কি আনন্দ পেয়েছিলেন, এই সব নানা কথায় ঘণ্টা দুই কেটে গেল, ওঁর খাবার সময় হয়ে গেল। সাড়ে আটটা-নটা নাগাদ খেতেন রাত্রে। উনি খেতে বসলেন, আমিও চলে এলুম। জানি তো দশ মিনিটেই খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বেন। সেইদিন যে চলে এলাম ওঁর কাছ থেকে তখন কি জানি যে সেই ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা হবে।

গভীর রাত্রে কমলা দেবীর লোক এসে বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডাকছে "শিগ্গির আসুন মা বললেন যে বাবু কথা বলতে পারছেন না।" আমরা তো তখুনি দৌড়ে গেলুম; গিয়ে দেখি যে উনি বিছানায় উঠে বসে আছেন—বড় বড় চোখ বিস্ময়ে ভরা—যেন বুঝতে পারছেন না কি হল হঠাৎ। আমি জিজ্ঞেস করলুম "কি হয়েছে দিনদা" বললেন, "বড় একটা বিপদ হয়েছে।" অত্যন্ত জড়িয়ে জড়িয়ে কথা। দিদি (স্ত্রী কমলা) যখন জিজ্ঞেস করলেন "কি বললেন রে? কিছু বুঝতে পারলি?" আমি বললাম 'না'। ভাবলাম ওকথা বলে আরো উতলা করে কি লাভ। এর পরই সৌম্যেন্দ্রনাথের মা—ওঁর নকাকীমা এসে পায়ে হাত যেই দিয়েছেন পা ঠাণ্ডা কিনা দেখার জন্য তখনই পাটা একটু সরিয়ে নিলেন, বোঝা গেল তখনও বোধশক্তি হারান নি যে গুরুজন পায়ে হাত দিচ্ছেন। তারপরই শোবার চেষ্টা করতে লাগলেন তাই শুইয়ে দেওয়া হল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেল। ডাক্তার আগেই ডাকা হয়েছিল তাঁকে নিয়েই ওঁর ভগ্নিপতি ডাঃ সুহৃৎ চৌধুরী এসে পড়লেন। যা করণীয় সবই করা হল কিন্তু কিছুই হল না, সকাল দশটার পর চলে গেলেন। তাঁর প্রার্থনা "যেন পড়ি আর মরি," তাই পূর্ণ হল। স্ত্রী কমলা দেবী কিন্তু কি জানি কেন কিছুদিন থেকেই এই বিপদের আভাস পাচ্ছিলেন এবং রাত্রিবেলা শোবার সময়ও দেহে মনে প্রস্তুত হয়েই শুতেন, যাতে প্রয়োজন হলে একটুও দেরি না হয়। যে মানুষটি স্বামী কপালে বা মাথায় হাত দিলেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন মাথায় কষ্ট হচ্ছে ভেবে, বারবার ডাক্তার ডাকার কথা জিজ্ঞাসা করতেন, স্বামী বিরক্ত হয়ে বলতেন "তোমার জ্বালায় কি একটু কপালে কি মাথায় হাত রাখতেও পারবনা।" বাড়ির বাইরে বেরোলে যে মানুষটির বিপদের উদ্ভট সব চিন্তা হত, যেমন যদি কোনো ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে ওঁর মোটরে লাফিয়ে পড়ে, এই সব কত কি, সে মানুষ সত্যিকার বিপদে একেবারে স্থির ধীর হয়ে যা যা যখন করণীয় সব করে গেলেন। আমায় পরে বলেছিলেন যে উনি সমস্তক্ষণ কেমন একটা বিপদের আভাস পাচ্ছিলেন ও দরকার হলে তক্ষুণি যাতে উঠতে পারেন সেইজন্য প্রস্তুত হয়েই শুতে যেতেন। যাঁর স্বামী ছাড়া আর ধ্যান জ্ঞান কিছু ছিল না তিনি স্বামী মারা যেতে কপিল মঠে সাংখ্যাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে, মাঝে মাঝে একটানা সেখানে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন ও পাঠ ধ্যান এসব নিয়ে

কাটাতেন। সাংখ্যের মত কঠিন বিষয় ওঁদের শিক্ষা ও সাহচর্য গুণে বেশ ভালোই বুঝতেন। ওখানে কোনো ভাবালুতার অবকাশ নেই। কাজেই ওঁর জীবনের ধারাই বদলে গিয়েছিল অবিশ্বাস্য রকম।

দিনেন্দ্র আগের দিন রাত্রেই ঈশ্বরের কাছে তাঁর একমাত্র প্রার্থনার কথা বলেছিলেন যে 'যেন পড়ি আর মরি'। বিধাতা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁকে একটি দিনের জন্যও শয্যাশায়ী হতে হল না। ঠাকুরবাড়ির দীর্ঘায়ু উনি পেলেন না, মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে চলে গেলেন। পঞ্চাশ পূর্তির জন্মদিনে তাঁর রবিদাদার আশীর্বাদ—"প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান,

দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।"—

বিফল করে দিয়ে দিনেন্দ্র অস্ত গেলন।

ঠাকুরবাড়িতে দ্বারকানাথের নাতির নাতি দিনেন্দ্রের জন্ম হল ২রা পৌষ ১২৮৯ সালে, ইং ১৮ই ডিসেম্বরে ১৮৮২ খৃস্টাব্দে, আর মৃত্যু হল ৫ই শ্রাবণ ১৩৪২ সালে, ইং ২১শে জুলাই ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে ঐ জোড়াসাঁকো বাড়িতেই।

দিনেন্দ্র যেখানে যেতেন সেখানেই আনন্দ সেইখানেই প্রাণের চাঞ্চল্য। প্রায় জনহীন জোড়াসাঁকো বাড়ি দিনেন্দ্রনাথ থাকাকালীন যেমন গানে গল্পে খেলায় শিশুকণ্ঠের কাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, শ্রাবণের এক সকালে অকস্মাৎ তা স্তব্ধ হয়ে গেল। দিনেন্দ্র অস্ত গেলেন—ঘনায়মান সন্ধ্যা পিছনে ফেলে। ঠাকুববাড়ির এক দিকপাল চলে গেলেন বিনা সমারোহে। যে মানুষটি একান্তভাবে আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে চলতেন সব সময়, মৃত্যুতেও সেই রকম আড়লে আড়ালেই চলে গেলেন, জনকোলাহল মুখর কলকাতা নগরীতে কোথাও এতটুকু আলোড়ন হল না। রবীন্দ্র-সৌরলোকের একটি জ্যোতিষ্মান বৃহৎ নক্ষত্র খসে পড়ল অনন্ত আকাশের বুকে।

তাঁর রচিত গানটিতে তাঁর শেষ কথাই যেন ধ্বনিত হতে লাগল :

বলা যদি নাহি হয় শেষ
তাহে নাহি মোর দুঃখ লেশ।
খেলেছি ধরার বুকে
সেই স্মৃতি বহি সুখে
ভাসাব তরণী সখি সেই অজানার দেশ।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী উৎসব

বহু নক্ষত্র এবং গ্রহ নিয়ে যেমন সৌরজগৎ তেমনি বহু উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আলোকমালায় সজ্জিত রবীন্দ্রজগৎ। চিন্তায়, কর্মে, সৃজনে যে অজস্র দান তিনি নিয়ে এসেছিলেন তা সহজেই সমাজের সব মানুষ গ্রহণ করতে পারে এমন নয়। তাই এমন কিছু কিছু মানুষ তাঁকে কাছে টেনে নিতে হয়েছিল যাঁরা নিজের গুণে তাঁরই সৃষ্টিকে সর্বজনসামগ্রী করে তুলবেন। সেই কাছে টানা মানুষগুলির একজন দিনেন্দ্রনাথ। কবি গান লেখেন, সুর দেন, তারপর সে সুর ভুলে যান। নূতনতর সৃষ্টির আবেগে পুরনো সৃষ্টিকে আর মনে থাকতে দেয় না। লেখার ক্ষেত্রে তাতে তত বিপদ নেই। কারণ কাগজে কালিতে তার একটা নতুন অস্তিত্ব গড়ে রইল। কবির বিস্মৃতি ছাপাখানার দৌলতে বড় লোকসান ঘটাতে পারবে না। কিন্তু সুর—সে যে গীত হবার পরমুহূর্তে হারিয়ে যাবে। ধরে রাখে কে ? প্রথম সৃষ্টির আবেগ ধরে রেখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কাঙালীচরণ সেন, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী প্রভৃতি। কিন্তু সেই সভালোভন গানের যুগ পেরিয়ে যেদিন কবির গান ধ্বনিত হতে লাগল শালবীথির মর্মরে, আম্রকুঞ্জের পল্লবপল্লবীতে সেদিন সেই খোলা হাওয়ার মুক্তি, সেই পুষ্পসৌরভের সৌগন্ধ্য যিনি লিপির বাঁধনে ধরে রাখলেন তিনিই দিনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত সম্মান জানিয়ে বলেছিলেন যতদিন তাঁর গান থাকবে ততদিন থাকবেন দিনেন্দ্রনাথ।

সেই দিনেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হল এবারে ১৯৮২-র ১৮ই, ১৯শে ডিসেম্বর। প্রস্তুতি চলছিল অনেকদিন ধরেই। টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট আর বৈতানিকের উদ্যোগে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি তৈরি হল। সারা বছর জুড়ে গানের আসর হল। শতবার্ষিকী কমিটির সদস্যগ্রহণের চেষ্টা হতে লাগল। স্মারকগ্রন্থ প্রস্তুতির আয়োজন চলতে লাগল।

১৮ই, ১৯শে তারিখের সভার স্থান ঠিক হল জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনের প্রাঙ্গণে। সুযোগ করে দিলেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। উৎসবে প্রধান অতিথির আমন্ত্রণ গেল শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী কৃষ্ণানের কাছে। ইনষ্টিটিউটের সদস্যা শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শেখায় শ্রীমতী সাবিত্রীর সতীর্থ। তিনিই যোগাযোগ করলেন। শতবার্ষিকী কমিটি ঠিক করলেন ১৯শে তারিখে সকালে সঙ্গীতমুখর একটি শোভাযাত্রা বার করবেন তাঁরা। আমন্ত্রণপত্র গেল শিল্পীদের কাছে, স্কুলে কলেজে, গানের স্কুলগুলিতে এবং পত্রিকার মাধ্যমে দেশের সকলকেই সেই শোভাযাত্রায় আহ্বান করা হল।

জন্মদিনে এই যে আসন পাতা

১৮ই ডিসেম্বর দিনেন্দ্রনাথের জন্মদিন। সেইদিন সন্ধ্যা ৬টায় জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনে দিনেন্দ্রশতবার্ষিকী সভার শুরু হল। সূচনা করলেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। সেই পুণ্যপ্রাঙ্গণে যেখানে একদিন দিনেন্দ্রনাথের ধ্যানগম্ভীর কণ্ঠের সুরবিস্তার মন্দ্রিত হয়ে উঠত সেখানে সকলকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন তিনি। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমতী সাবিত্রী কৃষ্ণান স্মরণ করলেন তাঁর সঙ্গীতজীবনের দুই গুরুকে—রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী জোর দিলেন অভিনেতা, কবি ও মানুষ দিনেন্দ্রনাথের উপরে। শৈলজারঞ্জন তাঁর গুরুর কাছে শিক্ষানবীশীর কথা আলোচনা করলেন। অমিতাভ চৌধুরী ক্ষুব্ধ কণ্ঠের বেদনা ছড়িয়ে জানালেন শান্তিনিকেতনে দিনেন্দ্রস্মরণের আয়োজন কি অকিঞ্চিৎকর। অরুণ ভট্টাচার্য দিনেন্দ্রনাথের স্মারকগ্রন্থ কী কী উপকরণে সজ্জিত হতে পারে তার আভাস দিলেন।

সভার প্রথমে শ্রীমতী মায়া সেনের নেতৃত্বে রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রছাত্রীরা গান গাইলেন। সভাশেষের গানগুলি গাইলেন শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৈতানিকের শিল্পীরা।

গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে

১৯ তারিখের ভোর ছটা থেকে কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির নীচে জড়ো হতে লাগলেন কলকাতার নানা প্রান্ত থেকে দিনেন্দ্র-অনুরাগী মানুষেরা। গড়িয়া, সন্তোষপুর থেকে যেমন এলেন, তেমনই এলেন বরানগর দমদম থেকে। হুগলী জেলা থেকে এল গানের দল। গানের নামকরা কোনো প্রথম সারির দলকে দেখা গেল না—অবশ্য রবিতীর্থ দিনেন্দ্র-সঙ্গীতায়তন এবং সুরঙ্গমার ছাত্রছাত্রীরা ছিল তাদের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে। অনভিজ্ঞ, অকুলীনের সংখ্যাই বেশি—দিনেন্দ্রস্মরণে সেইটাই বোধ হয় স্বাভাবিক, কেমন যেন মানিয়ে গেল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে ওঠা দলগুলির অনুপস্থিতিতে দুঃখিত মনে হল না কাউকে। হলদে জামা কাপড়ে গলায় মালা দুলিয়ে শিশু-চিত্তের আনন্দ বিকীর্ণ করে খোল বাজিয়ে শোভাযাত্রাকে নেতৃত্ব দিলে মৈত্রেয়ীদির খেলাঘর। দূর মধ্যমগ্রাম থেকে এই ছেলের দল গগনে আনন্দধ্বনি জাগিয়ে শোভাযাত্রায় এল। এল কলকণ্ঠ। তারাও ছোটদের দল, হাতে সুন্দর 'দিনেন্দ্রস্মরণে' লেখা দণ্ড। যাদবপুর-সন্তোষপুরের দক্ষিণী সংস্কৃতি পরিষদ খোলা গলায় গান ধরলে, দিনেন্দ্রনাথকে ভালবাসার এই রীতিটা তাদের যেন বেশ মনে ধরেছে মনে হল; গীতায়নের অমল মুখোপাধ্যায়ের দলটি বেশ বড়। ছাত্রছাত্রীদের সাড়া পেয়ে তিনি খুশি। সাংস্কৃতিকের সজল বসু সদলে যোগ দিয়েছেন। তিনি নিজে গান করেন কিনা জানি না কিন্তু পথচলার উদ্যমে কারো চেয়ে কম যান না। সবচেয়ে বড় দল নিয়ে শোভাযাত্রার অনেকটা জুড়ে পথ আলো করে চলেছিল নীলাদি মেঘমালাদি আর প্রতিমাদির নেতৃত্বে মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীরা। দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির ডাকে এদের সাড়া পাওয়া গেছে বেশ সক্রিয় ভাবেই। শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যাওয়ায় শেষে এসে যোগ দিলেন রেবাদি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের মেয়েদের নিয়ে। গোষ্ঠ

আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের মেয়েদের বিভাগের অধ্যক্ষা নীহারদি কলেজের মেয়েদের নিয়ে এলেন, এলেন সাবিত্রী কলেজের অধ্যক্ষা সদলে। ইংরাজির অধ্যাপক অতীশদা তাঁর ছোট দলটি নিয়ে যখন শোভাযাত্রায় জায়গা করে নিলেন তখন শোভাযাত্রার সকলেই খুশি কারণ অতীশদার সঙ্গে যে নামের ফেস্টুন সে হল প্রেসিডেন্সী কলেজ। শ্যাওড়াফুলি থেকে স্বরবিতান নিয়ে সানন্দে এলেন সলিলচন্দ্র ঘোষ। সুরুচিদি না থাকলেও রবিকর তার উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে সারাপথ। ব্রাহ্মসমাজের আনন্দিত দলটিকে গুছিয়ে নিয়ে চললেন অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস। রবীন্দ্রসাহিত্যের বাসুদেব চলেছিল সবান্ধবে। সবচেয়ে পিছনে টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, তার আগে বৈতানিক।

সারা পথ শোভাযাত্রার সম্মুখে ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। বয়সের অজুহাতে তাঁকে দুএকবার গাড়িতে তোলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু পথের আনন্দবেগে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে হাঁটলেন আগাগোড়া—কলেজ স্কোয়ার থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেন সুবিনয় রায়। সুশীল চট্টোপাধ্যায় আগাগোড়াই মাইকে গাইতে গাইতে চললেন। সঙ্গে সঙ্গে গানের দলগুলির সোল্লাস সঙ্গীতধ্বনিও চলতে লাগল। অমিয়, পার্থ, গৌরী রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শিহরণ জাগিয়ে দিল। পঁচাশী বছরের বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমাণ করলেন যে তিনি যথার্থ পদাতিক। প্রমথনাথ বিশী, সাবিত্রী কৃষ্ণান ও মৈত্রেয়ী দেবীও অনেকটা হাঁটলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দিনেন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনের বৈতালিকের প্রাণ। সেই বৈতালিক সেদিন ইঁট কাঠের কলকাতায় সুরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দিনেন্দ্রস্মরণের এই পদ্ধতি অভিনব এবং প্রাণস্পর্শী।

সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে

শোভাযাত্রা গিয়ে প্রবেশ করল মহর্ষিভবনের প্রাঙ্গণে। প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে শৈলজারঞ্জন, সুবিনয় রায় এবং সুশীল চট্টোপাধ্যায় গাইলেন 'জাগো জাগোরে, জাগো সঙ্গীত—চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত।' মনে হল সত্যি সত্যিই মুক্তবন্ধন সপ্তসুর যেন বিশ্ববিহার করে বেড়াচ্ছে আর গগন অঙ্গন যেন তাঁর বন্দনাগানে পূর্ণ হয়েছে।

ঠিক সাড়ে নটায় সকালের অধিবেশন শুরু হল। দিনেন্দ্রশতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসু সভা পরিচালনা করেছিলেন। শোভাযাত্রা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ঢুকল মহর্ষি ভবনের প্রাঙ্গণে। চেয়ারগুলো ভরে গেল, পিছনের সিঁড়িতে বসে গেল সবাই, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল উপাসনার বারান্দায়। প্রাঙ্গণ ভরে উঠল, কিন্তু কি শান্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সভা শুরু হল। সোমেনদা বললেন "এই প্রাঙ্গণে কতবার দিনেন্দ্রনাথের জলদমন্দ্র কণ্ঠের গান ধ্বনিত হয়েছে, কখনো মাঘোৎসবে, কখনো সমাজের অন্তর উপাসনায়, আবার বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে। আজ সেই প্রাঙ্গণে সেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্যকে সম্মান জানাবার জন্যে আমরা সমবেত। শিল্পী যাঁরা এসেছেন বড় হোন ছোট হোন সকলেই দিনেন্দ্রনাথের ছাত্র। পথ জুড়ে গান গাইতে গাইতে আমরা এসেছি—আজ এই প্রাঙ্গণেও

আমাদের সকলের কণ্ঠ ধ্বনিত হবে।" প্রথমে সুশীল চট্টোপাধ্যায়, কুমকুম চট্টোপাধ্যায় এবং সুবিদ ঠাকুর গাইলেন 'কবে আমি বাহির হলেন তোমারি গান গেয়ে' আর 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী'। সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে সেই গান সহস্র কণ্ঠে জেগে উঠল। এমন অভিজ্ঞতা গানের আসরে হয় না। গায়ক এবং শ্রোতার সম্মিলিত সুরের আলোয় জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনের উঠোন ছেয়ে গেল। প্রথম গানটির পর সুশীল চট্টোপাধ্যায় সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনারা আরও জোরে করুন সকলে গলা মেলান।' গাইতে যারা জানে না তারাও উচ্চকণ্ঠ হল। মনে রাখবার মত একটি সকাল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী সমিতি আমাদের উপহার দিলেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী সূচী ছিল প্রখ্যাত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। শান্ত নম্র বিনয়ী এই শিল্পী যখন মঞ্চে উঠলেন তখন কী আকুল প্রত্যাশা শ্রোতাদেব মনে। এ তো অন্যদিনের মত শুধু গানের আসর নয়, এ রবীন্দ্রসঙ্গীতেব শ্রেষ্ঠ শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথের প্রতি আজকের প্রধান শিল্পীর সম্মান গানের উপহারে। সমস্ত প্রাঙ্গণ ছবির মত মুগ্ধ হয়ে রইল। হেমন্তবাবু একে একে গাইলেন 'তোমার আসন শূন্য আজি' 'আমার আর হবে না দেরী,' 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে'। প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হল বেদনা—তাহলে কি সত্যিই তানপুরার তারে ধুলো জমেছে, ঘরের দ্বারে কাঁটালতা উঠেছে। কিন্তু সকল সংশয়মুক্ত হেমন্তবাবুর স্বচ্ছ কণ্ঠের গান বেদনার সঙ্গে যেন একটু আশ্বাস আনল যে এখনো সময় আছে বলবার 'তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে'।

হেমন্তবাবুর পর গাইলেন দিনেন্দ্র সঙ্গীতায়তনের শিল্পীরা। প্রফুল্ল দাস মহাশয় নিজেই এস্রাজ নিয়ে বসলেন। খোলা গলায় সমবেত কণ্ঠের গান আশ্চর্য মিলেছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে খেলাঘর, কলকণ্ঠব শিশুশিল্পীরা গাইলেন, গাইলেন দক্ষিণী সংস্কৃতি পরিষদ আর গীতায়ন। সভা ভাঙবার মুখে এসে পড়লেন 'ইন্দিরা'র শিল্পীরা। তখন ভাঙা হাট, দূরের যাত্রীরা অনেকেই চলে যেতে উৎসুক। কিন্তু যাঁরা ছিলেন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন গানের এমন উন্নত মান সচরাচর দেখা যায় না। একটু দীর্ঘ সময় থাকতে হল, কিন্তু গানে প্রাণ ভরে গেল।

মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে

উৎসবের শেষ অধিবেশনে ছিল শুধুই গানের আসর। উদ্বোধন করলেন সুবিদ ঠাকুর, পারিবারিক সুকণ্ঠের অধিকার যিনি একাই রক্ষা করতে পেরেছেন। তিনি যখন গাইলেন 'ধীরে বন্ধু ধীরে চলো তোমার বিজন মন্দিরে' তখন মনে পড়ল যে এই প্রাঙ্গণে একদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ফাল্গুনী নাটকে এই গান গাইতেন। সমস্ত অনুষ্ঠানের সুরটি সুবিদ ধরে দিলেন – সুরে, গাম্ভীর্যে, বেদনা-সঞ্চারে। তাঁর পরে গাইলেন মেখলা দাশগুপ্ত। আত্মস্থ ধ্যানমগ্ন, স্পষ্ট অথচ মধুর উচ্চারণ। মনে হল এই শিল্পী তাঁর যোগ্য সম্মান আজও পাননি।

তারপর দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছিলেন এমন ছাত্রছাত্রীরা বসলেন গাইতে। প্রথমেই

গাইলেন অমলা রায়চৌধুরী। প্রবীণতার ছাপ চেহারায়, সাজসজ্জায়—কিন্তু সমস্ত প্রাঙ্গণ যেন সুরের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল যখন তিনি গান ধরলেন 'প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর।' এ যেন এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার—এমন গান এই প্রবীণার কাছে শোনা যাবে এ কারো প্রত্যাশা ছিল না। গান শেষ করতে না করতেই শ্রোতাদের দাবী সরব হয়ে উঠল। শ্রোতাদের সম্মান দিয়ে অমলাদি আবার গাইলেন 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী'। সত্যি সত্যিই যেন সুরের আলোয় ভুবন ছেয়ে গেল। দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন অমলাদি। তাঁরপর গাইলেন রমাদি—রমা চক্রবর্তী—'আমি কান পেতে রই'। পুরানো গায়কীর সাবলীল চালে সহজ স্বচ্ছগতি সে গানের। তিনিও দিনেন্দ্রস্মরণে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা পড়লেন। দিনেন্দ্রনাথের আর এক ছাত্রী অরুন্ধতী ঘোষ চিকিৎসকের পরামর্শে গান ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু গুরুর শেখানো এস্রাজে সুর তোলার খেলাটি ছাড়েন নি। এবার তিনি এস্রাজে বাজালেন 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে' গানটি। অমিতা ঠাকুর দিনেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্রী। তিনি একটি কবিতা পড়লেন। শ্রোতাদের দাবী মেনে নিয়ে মঞ্চে উঠে এলেন অশীতিপর শৈলজারঞ্জন। গাইলেন 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে'। যারা তাঁর গান আগে শোনেন নি তাঁদেরও একটা অভিজ্ঞতা হল। তারপর গাইতে বসলেন সাবিত্রীদি—সাবিত্রী কৃষ্ণান। রবীন্দ্র-অনুরাগীরা তাঁর নাম জানেন, জানেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর গান থেকে সুর সংগ্রহ করেছিলেন। তাই প্রত্যাশা ছিল অনন্ত। সভা জাঁকিয়ে রাজেন্দ্রাণীর মত বসলেন সাবিত্রীদি। তারপর সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সমুদ্রতরঙ্গের প্রতিধ্বনি তুলে গাইলেন মীনাক্ষী ভজন, 'বাসন্তী হে ভুবন-মোহিনী', 'নীলাঞ্জন ছায়া' আর তার মূল দক্ষিণী গানটি। এই গানগুলি খুব পাকা শিল্পীর কণ্ঠেই রেকর্ড হয়েছে—তার মাধুর্য আমরা অনুভব করেছি কিন্তু 'সরোবরতীরে নদীনীরে ব্যাপিল অনন্ত মাধুরী' অথবা 'বিচলিত চিত্ত উচ্ছলি উন্মাদনা' যে এত গভীর গাম্ভীর্যমণ্ডিত হতে পারে তা এ গান শোনার আগে যেন বোঝাই যায়নি। 'কান্তবিরহকান্তারে চিত্ত মোর পন্থহারা' এই বেদনা সাবিত্রীদির গলায় যখন রূপ পেল তখন তার পবিত্রতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ রইল না কারো মনে।

তারপরে আরও দুজন শিল্পী ছিলেন—এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় এবং প্রসাদ সেন। দুজনেই সভার উপযোগী গান গাইলেন। শ্রেষ্ঠ গুরুর প্রতি সম্মান নিবেদনে নিজেদের যেন সমর্পণ করলেন গানে গানে।

সারা সন্ধ্যা শিল্পীদের সুর ধরাতে বেহালা নিয়ে বসলেন অর্ধেন্দু ঘোষ আর এস্রাজ নিয়ে নির্মল দে, তবলায় সঙ্গত করতে লাগলেন বৈতানিকের দত্তবাবু। চোখের সামনে বসেও তাঁরা নেপথ্যে পড়ে যান। তাঁদের কথা তাই বিশেষ করে উল্লেখ করছি।

নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে শ্রোতারা সভা শেষে ঘরে ফিরেছিলেন। কত রকমের গানের সন্ধ্যার বিজ্ঞাপন তো নিত্য দেখি—কিন্তু এমন একটি সন্ধ্যার জন্যে যে আবার এক শতাব্দীর প্রতীক্ষা।

এই উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। রবীন্দ্রনাথের দুটি রচনা, প্রমথনাথ বিশীর একটি রচনা এবং অন্যান্যদের রচনার সংকলন এই সুদৃশ্য গ্রন্থটির গৌরব বাড়িয়েছে।

DINENDRANATH TAGORE CENTENARY ADDRESS

SMT. SAVITRI DEVI KRISHNAN

Dear friends,

I deem it a great pleasure to be in your midst to-day to participate in the centenary celebrations of revered Dinendra Nath Tagore, a great reformist, greater musician and one of the greatest human beings. I am grateful to my dear friends Prof. Pramathanath Bisi, Srimati Rama Chakrabarty, Sri Somendranath Bose, Shrimati Pranati Mukherjee and others who have invited me from Bangalore to be the Chief Guest of the function today.

It is really nice that our people still remember the good deeds of our beloved leaders of the past and celebrate their centenaries, with all humility, devotion and respect. This is more so with our Tagore Research Institute and Baitanik who have arranged the centenary celebrations of beloved Dinda this year. Last year, as you all know the Institute celebrated the centenary of Acharya Kshiti Mohan Sen Sastriji.

You are perhaps surpised as to how a South Indian lady has been your Chief Guest today. You see, I was, of course, born in Karnataka, but I was nourished and brought up physically and spiritually by our great Master Gurudev Rabindranath Tagore, grandpa of Dinda. I was a student at Theosophical High School, Adyar, Madras. Gurudev was going to London via Madras with Deenabandhu C. F. Andrews, Prosanto Mahalanobis, his wife Ranidi, Ariam Williams and Banamali who used to help Gurudev. Mrs, Annie Besant, President of the Theosophical Society invited Gurudev to be her guest for a few days at Adyar. While resting at Adyar, Gurudev wished to listen to some music. One of my teachers, painting master C. N. Vasudevan, who is no more, forced me and took me to Gurudev to sing some songs before him. I sang some of

Saint Kabir and of Saint Meera. Gurudev listened with rapt attention and being greatly pleased with the music asked me to sing some South Indian songs. He decided on the spot to take us to Shantiniketan; me, my elder and younger sisters and my uncle Dr. Govind Puttiah, who later became the Professor of Eastern Philosophy at Los Angeles, U. S. A. My elder sister Mrs. Shivakarun Vrilley who took diploma from Madam Montessori came away to Patna after some time and she is running a Bal Vikas Public School there. My younger sister, Dr. Saraswathi has become a reputed doctor of medicine and is staying at Bangalore.

I continued in Santiniketan as a beloved daughter of Gurudev. I am proud to say this because Gurudev's affection and love were really divine and fatherly. He taught me Rabindra Sangeet personally and I became proficient in that music. Thus I am more a Bengali by all means than a South Indian. South gave me birth but Bengal broughht me up and made me her daughter.

Gurudev was fond of Karnatic tunes. He used to ask me to sing Karnatic songs and would keep the tune and compose his own words in Bengali and ask me to sing again in that tune of his own. He liked not only Karnataka songs by Saint Thyagaraja Dikshithar etc., but also Meera Bhajans. I used to sing all of them including Meera Bhajans to the delight of Gurudev and Dinda. Gurudev was asking me to get the tunes perfected by Dinendranath Tagore who himseslf was a great musician. Dinda helped me to set the tunes perfectly in Bengali and liked my rendering of Bengali songs set to his tunes in Rabindra Sangeet. I will show you an example now.

Thus Dinendranath Tagore helped me in setting tunes to the delight of Gurudev. In this way Rabindra Sangeet grew with me at Shantiniketan because both of us were being cherished by Gurudev with affection and love. You will see some of my songs set to Dinda's and Gurudev's tune in "Geetabitan" of Gurudev. All the credit for these tunes should go to Dinda. We did not have Tanpura or Harmonium then.

Dinda was a hard task master but at the same time very kind and affectionate. Whenever I went wrong in singing his tune, he would show

his bulging red eyes and growl and grunt at me but only for a small while. He would soon become his former self and fondle me as his daughter. I used to listen to his heavenly music carefully from his room and try to repeat it alone in gardens outside. Dinda observed my musical taste and lonely ***abhyas*** and used to speak to Gurudev about me in appreciative terms.

Dinendranath Tagore, a glorious musician was a great humanist also. He never sought after name, fame or honour. He was great in his own way and was a pure exponent of traditional music and especially of Rabindra Sangeet. Dinda's contribution to Indian music was quite rich and his assistance to Gurudev in composing his great poems was of unquestionable importance.

When Gurudev composed any song specially for me and sent word to Dinda to come and listen, he used to be furious because his afternoon siesta was disturbed. But, all the same, he would come and sit near me at Uttarayan grumbling that Rabida was mad about my singing. After listening to my songs, Dinda used to be in tears and say "Rabida, how could you compose ! And from where did you get these words !" Then Tagore, the great poet, used to feel moved and proud at the same time and would shake his legs in joy. Then all the anger of Dinda came down and he used to become peaceful and happy. He was a great soul and very large-hearted person. Many times I used to force Dinda to teach Hindustani Music. One day he got irritated and said in Bengali "Come I will teach you a song" which I remember even now and will show you, I mean I would like to, as the meaning of the song is interesting. Dinda's wife Kamala Devi (Kamal Bowthan) was a very beautiful and sweet lady and used to give lots of sweets like Rosogulla, Sandesh, etc. to eat and encourage me to sing and sing to the point of bliss and ecstasy. His house has a special name "Sura Puri" at Shantinekatan. Thus I was lucky to learn Rabindra Sangeet at the feet of the great maestro Dinendranath Tagore and Gurudev and spread the same to all the music lovers in India and abroad. I had lots of concerts even in foreign countries like Canada and I always cherish and remember Gurudev and Dinda as my great masters.

Well, my dear friends, I have taken much of your valuable time. I once again thank you for giving me an opportunity to offer my prayers and respect to Dinda today. I also congratulate you all for having successfully celebrated the centenary of Dinda and wish you, the Tagore Research Institute, Rabindra Bharati Univesity and Baitanik a very bright and successful future.

Thank you,
Smt. Savitri Devi